প্রতিশোধ

প্রফুল্ল রায়

সেরা
প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড
৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

১লা আশ্বিন ১৩৬৯

শ্রীঘনশ্যাম পোড়েল এট্ সেটেরা পাবলিকেশন্স্ বিবেকানন্দ রোড, বারাসাত উত্তর চব্বিশ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও কমলা প্রেস ২০৯এ, বিধান সরণী কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীমতী আরতি দেবী

করকমলেষু

কোন এক মধুর সকাল বেলায়, বাংলার কোন একটি গ্রামের প্রান্তে গ্রামের জমিদার-পুত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর বন্দুকের গুলিতে আহত একটি রক্তাক্ত পাখী পাশের গ্রামের একটি মেয়ের গায়ের উপর গিয়ে না পড়লে এ কাহিনীর সূত্রপাত হ'ত না। সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন করা যাদের অভ্যাস, তাঁরা অবশ্য এ রকম ঘটনা-সমাবেশে আপত্তি তুলতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন যে, রক্তাক্ত পাখীটি ওই মেয়েটির গায়ে ছাড়া আর কি কোথাও পড়বার জায়গা পায়নি। আমরা উত্তরে বলতে পারি যে, পাখীটি যে কোন জায়গাতেই পড়তে পারতো কিন্তু তা হলে এ কাহিনী অলিখিত-ই থাকত। আমাদের নিত্যকার একঘেয়ে জীবনে সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে বলেই অসাধারণ কাহিনীর সূত্রপাত হয়।

ছেলেটির পরিচয় আগেই একটু দেওয়া হয়েছে। সে গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। বহুদিন কলকাতায় থেকে পড়া-শুনা করবার পর ছুটিতে এবার গ্রামে এসেছিল কিছুদিন বিশ্রাম করতে। কিন্তু গ্রামের নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে জীবনে বিশ্রাম তার কাছে ক্রমশঃ বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। সেই জন্যেই বুঝি সকালবেলা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সে বন্দুক হাতে পাখী শিকারে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাখী মারতে গিয়ে নিয়তি তাকে দিয়ে এমন অসাধারণ লক্ষ্যভেদ করাবে তা বুঝি তার ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। পাখীটি যে মেয়েটির গায়ের উপর গিয়ে পড়ল তাকেও একটু চেনা দরকার। নির্মলা গ্রামের দরিদ্র পুরোহিত উমানাথ ভট্টাচার্যের একমাত্র মেয়ে। বয়স নিতান্ত অল্প নয়; অর্থাভাবেই এতদিন বিয়ে-থা বোধহয় হয়নি। প্রকৃতিটি একদিকে যেমন মধুর, আর একদিকে তেমনি দৃপ্ত। সকাল বেলায় সবে পুজার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে সে বাড়ী ফিরছিল, হঠাৎ এই বিভ্রাট। পুজার উপাচার এইভাবে নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত রেগে উঠে সে বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়েই বন্দুক হাতে বিজয়ের দেখা পেলে। পরিচিত অপরিচিত,

শোভনতা-অশোভনতা বিচার ক'রবার ধৈর্য তখন তার নেই। একেবারে আগুন হয়ে গিয়ে যে প্রথমেই ভৎ'সনা ক'রে বললে—কি রকম লোক আপনি? এটা বাঘ ভাল্লুকের জঙ্গল নয়—মানুষের গ্রাম তা জানেন? বন্দুক নিয়ে বাহাদুরিটা গ্রামের ভেতর না দেখালেই নয়?

বিজয় ফুঁ দিয়ে বন্দুকের নলটা পরিষ্কার করে নিতে নিতে হঠাৎ এই অতর্কিত আক্রমণে একটু বিস্মিত হয়েই মুখ তুলে তাকালে। সংকুচিতভাবে বলতে গেল,—দেখুন আমি ঠিক···

কিন্তু নির্মলা তাকে আর কথা শেষ করতে দিলে না, নিজের রক্তাক্ত শাড়ীর আঁচলটা দেখিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বললে,—দেখেছেন কি হয়েছে? আমার সমস্ত পূজোর আয়োজন আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন, জানেন? কি অধিকারে আপনি গ্রামের মধ্যে শিকার করেন?

এই ভৎ'সনার মাঝেও মেয়েটিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বিজয় এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। মেয়েটি চুপ করতেই সে বললে,—আমার সত্যি অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা কর নির্মলা।

এবার নির্মলার বিস্মিত হবার পালা। নিজের নাম অপরিচিতের মুখে শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই বিজয় হেসে বললে,—আমায় চিনতে পারছ না নির্মলা? আমি বিজয়।

খানিক বিস্মিত হয়ে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে নির্মলা এবার মুখ না নামিয়ে পারলে না, বললে,—কিন্তু এখানে পাখী মারা খুব অন্যায় হয়েছে!

ঈষৎ ভৎ'সনার ঝাঁঝ থাকলেও সুর তার এখন অনেক নরম।

বিজয় হেসে বললে,—তা স্বীকার করছি, কিন্তু পাখীটা এমন বেয়াড়া ভাবে তোমার গায়েই গিয়ে পড়বে তা ভাবতেই পারিনি। বিজয় একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলে, আমায় কি তুমি চিনতেই পারনি নির্মলা?

নির্মলা মাথা নিচু করে বললে,—পেরেছি।

তাহলে' এখনো ক্ষমা কর নি বুঝি—

আমি কি তা বলেছি—নির্মলার গলার স্বরে এখনো যেন বিরোধের আভাষ !

ক্ষমা যে করেছ তাও ত' বলনি ! কিন্তু আগেও তো আমি পাখী মেরেছি নির্মলা। মনে পড়ে ? তখন কিন্তু পাখী শিকারে তোমার বেশ উৎসাহই ছিল। এমন কি আমার হাত থেকে এয়ারগান কেড়ে নিয়ে ছুঁড়েছ !

নির্মলা এবার হেসে ফেললে,—বিজয় আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বললে,—তা' হলে মনে পড়েছে দেখছি। ওঃ কি দুষ্টই ছিলাম আমরা !

নির্মলার মুখের সমস্ত মেঘ এবার কেটে গেছে দেখা গেল, নিজের অজ্ঞাতেই সে উৎসাহের সঙ্গে বলে ফেললে—মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন।

বিজয় একটু হেসে বললে,—ঠিক সেদিন নয়, অনেক দিন হ'ল। তোমায় তো আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। কত বড় হয়ে গেছ।

তুমি নিজে বুঝি ছোটটি আছ, আমি তো ভেবেছি কে না জানি এক জাঁদরেল শিকারী।

কিন্তু জাঁদরেল শিকারীকেও যা ধমকটা দিলে

নির্মলা গম্ভীর হবার ভাণ করে' বললে,—অন্যায় করলে ধমক খাবে না ? তুমি অমন করে পাখী মারলে কেন ?

আহা ! আবার সে কথা কেন ? পাখী না মারলে কি তোমার সঙ্গে দেখা হত ?

তুমি ভারি নিষ্ঠুর তো ! পাখী না মারলে বুঝি আর দেখা হত না ?

কি করে হতো ?—পড়াশুনোর জন্যে ক'বছর আর গ্রামে আসিনি। তোমরা আমাদের গ্রাম ছেড়ে এগাঁয়ে উঠে এসেছ ত তো জানিই না।

পড়াশুনোর ছুতো করা কেন ?—এবার নির্ম্মলার স্বর আবার বুঝি একটু ঝাঁঝাল,—বল, সহর ছেড়ে এখানে আসতে ভাল লাগতো না !

তা একেবারে মিথ্যে বলনি, সময় যেন এখানে কাটতেই চায় না। আজকে নেহাৎ কিছু না পেয়েই তো বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম।

এমন পোড়া গ্রামে না এলেই পার। এখানে কি মানুষ আসে !—বলে নির্ম্মলা মুখ ফেরালে।

অভিমানের সুরে বিপদের আভাষ পেয়েই বিজয় তাড়াতাড়ি বললে,—অমনি ক্ষেপে গেলে তো ? আমি কি তাই বললাম। শুধু দেখতেই বড় হয়েছো, স্বভাবটি ঠিক তেমনই আছে দেখছি।

এত তোমার সহর নয়, এখানে রোজ রোজ কেউ বদলায় না—নির্ম্মলার স্বর এখনো গম্ভীর।

বিজয় গলা নামিয়ে বললে—সহর তো তাই বার বার হার মেনে ফিরে আসে।

নির্ম্মলার চোখে একটু আবেশ যেন দেখা দিয়েছিল, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে—বাবার পুজোর বেলা হয়ে, গেল, আমি চলি—

নির্ম্মলা কয়েক পা এগিয়ে গেল। বিজয় একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বললে,—দাঁড়াও আমি যাব যে !

তুমি কোথায় যাবে ?

কেন, তোমাদের বাড়ী।

আমাদের বাড়ী যাবে তুমি !—নির্ম্মলা সত্যি বিস্মিত।

কেন, যাই নি কখনও ! ছেলেবেলায় কত জ্বালাতন করেছি তোমার বাবা-মাকে !

এখন তো আর ছেলে বেলা নয়—

বিজয় হেসে বললে,—যেতে বারণ করছ তা হ'লে ? কিন্তু—

কিন্তু আমার যে ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে। একটু জল খেতে দেবে না ?

এই সকাল বেলায় পিপাসা !—নির্মলা হেসে ফেললে।

বিজয় অম্লানবদনে বললে,—আমার ঐ রকম বেয়াড়া পিপাসা !

নির্মলা হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বললে,—বুঝিছি, চল।

নির্মলাদের বাড়ী বেশী দূর নয়। বাড়ীটি দেখলেই এই পরিবারটির সাংসারিক অবস্থাটি বুঝতে দেরী হয় না। চালে খড় নেই, চারিধারের দেওয়াল বহুদিনের সংস্কার অভাবে ধসে পড়েছে ; কিন্তু তবু উঠান থেকে মাটির দাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত পরিষ্কারভাবে নিকান পোঁছান দেখে বোঝা যায় যে অসচ্ছলতা এ সংসারে কোন অভাবের গ্লানি আনেনি। বিজয়কে দাওয়ার কাছে দাঁড় করিয়ে নির্মলা ঘরের ভেতর গেছল। হঠাৎ মস্ত বড় একটি জলভরা ঘড়া এনে তার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললে—নাও খাও !

বিজয় প্রথমে অবাক হয়ে তারপর হেসে ফেললে।

—এটা কি পান করবার না স্নান করবার ?

স্নান করবার কেন হবে ? তোমার না ভয়ানক পিপাসা ?—বলে নির্মলাও হাসল। নির্মলা হয় তো আর কিছু বলতো, কিন্তু ইতিমধ্যে মা এসে অপরিচিত একটি যুবককে বাড়ীর ভেতর দেখে একটু সঙ্কুচিত হয়ে মাথায় কাপড় টেনে সবিস্ময়ে নির্মলার দিকে তাকালেন। মায়ের ভাব গতিক দেখে নির্মলা হেসে ফেলে বললে,—চিন্‌তে পারলে না মা ? ইনি মস্ত বড় শিকারী, তবে জঙ্গলের চেয়ে গ্রামের ভেতরেই রক্তারক্তি করতে ভালবাসেন।

মা এতক্ষণে চিনতে পেরেছেন। বললেন,—তুই থাম বাপু ! আমাদের বিজয় না ? কি আশ্চর্য্য আমি যে ভাবতেই পারিনি তুমি এই গরীবের কুঁড়েতে দেখা করতে আসবে !

নির্ম্মলা বিজয়ের দিকে একবার দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে,—উনি কি আর এমনি এসেছেন মনে কর। এসেছেন নেহাৎ পিপাসার জ্বালায়।

মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, ওমা, তা জল টল দিস্ নি?—

নির্ম্মলা হাসি চেপে বললে, হ্যাঁ জল তো দিয়েছি মা।

শুধু জল দিয়েছিস নাকি, দেখ দিকি কি কাণ্ড!—মা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, কিন্তু পরের মুহূর্তেই দুঃখের সঙ্গে বললেন,—কিন্তু গরীবের ঘরে কি বা তোমায় দেব বাবা! দুটো মুড়কি-মোয়াও নেই—

নির্ম্মলা গম্ভীর হবার ভাণ ক'রে বললে,—তুমি থাম মা! জমিদারের ছেলে মুড়কি মোয়া খায় না।

প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি বদলাবার জন্য বিজয় বললে,—আর আমার কিছু দরকার নেই মাসীমা। আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলাম।

মা খুসী হয়ে বললেন,—বেশ করেছ বাবা। সেই ছেলে বেলায় আসতে, তারপর কতদিন দেখিনি!

বিজয় একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল—আমি যে এখানে ছিলাম না মাসিমা। এই ক'বছর কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছি, তাই আসতে পারিনি।

আর তারপর এই ক'মাস ছুটিতে এসে আমাদের বাড়ী আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না—নইলে কবে আসতেন।—নির্ম্মলার চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি।

বিজয়ের পক্ষে অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ বাইরে দুজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। একজন নির্ম্মলার বাবা গ্রামের পুরোহিত উমানাথ ভট্টাচার্য্য, আর একজন গ্রামেরই একটি অত্যন্ত পরোপকারী ছেলে, নাম পরিতোষ। বিজয়ের সে বাল্যবন্ধু।

শোনা গেল. পরিতোষ পুরুত মশাইকে মৃদু ভর্ৎসনা করতে

করতে আসছে, আপনি তার চেয়ে বনে গিয়ে বাস করুন। সংসার করবার বিড়ম্বনা আপনার কেন!

বাড়ীর ভেতর ঢুকে একটি পুঁটলি নির্ম্মলার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে সে বললে,—এই নাও মাসীমা! ভাগ্যিস আমি ছিলাম, নইলে আজও উমা-খুড়ো তোমাদের উপোসের ব্যবস্থা ক'রে আসছিলেন। জমিদার বাড়ীর আদায়পত্র উনি রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিচ্ছিলেন আর কি?

উমানাথ ভট্টাচার্য মৃদু প্রতিবাদ করে' বললেন—না—না, ঘোষাল বড় মুখ করে' চাইলে সকাল বেলা

তাই দরাজ হাতে দক্ষিণার টাকাটা দিয়ে দিলেন, কিন্তু তার উপর এই চালডালগুলোও না দিলে চলছিল না—বলে পরিতোষ হাসলে!

উমানাথ সলজ্জভাবে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলেন,—জান না পরিতোষ ওদের বড় অভাব। দু'বেলা খেতে পায় না।

পরিতোষ বাধা দিয়ে বললে,—আর আপনার বাড়ীতে বুঝি দু'বেলা যজ্ঞি লেগে আছে!

উমানাথ আরও যেন বিব্রত হয়ে বললেন,—না, তা নয়, তবে কি জান, আমাদের এমন এক আধ দিন উপোস করা অভ্যেস আছে।

এবার সবাই হেসে ফেললে।

পরিতোষ বললে—সুতরাং আর ভাবনা কি? আচ্ছা, নির্ম্মলা কত বড় হয়েছে সে খেয়াল আপনার আছে? ওর বিয়ে-থার ব্যবস্থা করতে হবে না? শুধু উপোস করতে জানলেই হবে?

উমানাথ এবার হেসে বললেন,—সে ভাবনা ভগবান ভাববেন।

তার বেলা ভগবান ভাববেন। পরিতোষ সকৌতুক স্বরেই বললে, শুধু ঘোষালের ভাবনাটা বুঝি ভগবানের হয়ে আপনাকে ভাবতে হবে? বাঃ ভগবানের উপর কি দয়া। চলে এসো বিজয়, এদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকলে আর মাথার ঠিক থাকবে না।

নির্ম্মলার মা এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন, মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে এইবার না বলে' পারলেন না,—তুমি ঠিক বলেছ বাবা পরিতোষ! এতবড় সোমত্থ মেয়ে, ওকে আর ঘরে রাখা যায়?

পরিতোষ হেসে বললে—বেশত, তাহলে ঘর থেকে বার করে দিন? কি বলিস নির্ম্মলা?

মা গম্ভীর হয়ে বললেন,—না বাবা হাসবার কথা নয়। তোমরা যদি একটু চেষ্টাচরিত্র না কর তাহলে আর কে করবে। ওঁকে ত জান, কোন কাজ যদি ওঁকে দিয়ে হয়। অথচ মেয়ে ত' দেখতে দেখতে তালগাছ হয়ে উঠেছে।

পরিতোষ নির্ম্মলার দিকে চেয়ে হেসে বললে,—ওইত নির্ম্মলার দোষ। আচ্ছা মাসীমা এবার নির্ম্মলাকে বাড়ী থেকে বিদেয় না করে ছাড়ছি না। যেখান থেকে হোক একটা পাত্র ধরে আনবোই। আর আমিই বা কেন—এই বিজয় ত' আমার চেয়ে ভাল পারবে। কিহে বিজয়! তোমার জানা-শুনো কলকাতাতে বন্ধুদের ভেতর একটা পাত্র মিলবেনা?

বিজয় গম্ভীর হবার ভাণ করে বললে,—পাত্র মিলবে কিন্তু পাত্রীর সঙ্গে মিলবে কিনা তাই ভাবছি।

এবার নির্ম্মলাই বিজয়ের দিকে ভ্রূভঙ্গী করে ফোঁস ক'রে উঠল, —মা সারা সকাল বসে বসে এই বাজে গল্প করবে?—কাজ-কর্ম্ম আর নেই? আমি বাবার পূজোর যোগাড় দিতে চললাম।

নির্ম্মলা সত্যিই আর সেখানে দাঁড়ালোনা। সেদিকে চেয়ে হেসে পরিতোষ বললে,—ওহে লক্ষণ ভালো নয়। নির্ম্মলা চটেছে। আমি চললাম। কিন্তু বিদেয় আমি নির্ম্মলাকে করবই।

বিজয়ও তার সঙ্গ নিয়ে বললে,—আচ্ছা মাসিমা আর একদিন আসব একেবারে ভাল পাত্রের খবর নিয়ে।

নির্ম্মলার মা খুশি হয়ে বললেন,—আমাদের ভাগ্য বাবা।

পরিতোষ আর বিজয় ছেলেবেলার বন্ধু। ছেলেবেলায় এই গ্রামে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছে। গ্রামের পথে একসঙ্গে ফিরতে

ফিরতে পরিতোষ হেসে বললে,—তারপর কুমার বাহাদুর। তোমায় এদের বাড়ী দেখব বলে ত' আশা করিনি!

বিজয় জবাব দিলে,—কেন এমন আশ্চর্যটা কিসের? ছেলে-বেলার সাথী। তখন ত' এ বাড়ীতেই সারাদিন কাটাতাম!

কিন্তু ছেলেবেলা ত' আর নেই,—এখন তো আর গ্রামে আসতেই চাওনা। ক'বছর পরে গ্রামে এলে বলত?

বিজয় একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল,—সত্যি ভাই পড়াশুনার জন্যে···

পরিতোষ আবার গম্ভীর হয়ে উঠল,—দেখ ভাই ও দোহাই দিওনা, ছুটিছাটায় এক আধবার গ্রামে এলে পড়াশুনায় ক্ষতি হয় না! এ দিকে গ্রাম গেল গ্রাম গেল বলে বলে চিৎকার কর অথচ তোমাদের মত লোক যদি গ্রামের দিকে না চায়···

বিজয় হেসে ফেলে বললে,—ওই তোমার বক্তৃতা আরম্ভ হলো ত ভাই, আমার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তোমার মত গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে ত' পারতাম না।

পরিতোষ একটু ম্লান হেসে বললে,—আমার কথা ছেড়ে দাও মা বাবা মরা অনাথ ছেলে, মামাদের দয়ায় মানুষ। এই গ্রাম ছাড়া আর কি নিয়ে থাকবো বল। কিন্তু আমার মত লোকের দ্বারা কতটুকুই আর সম্ভব, কতটুকুই আর হতে পারে—তোমাদের মত লোক যদি গ্রামের দিকে না চায়—

পরিতোষের কথা আর শেষ হল না। গ্রামের একটি ছেলে দূর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—পরিতোষদা তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি···

যে সব ছেলেদের দল নিয়ে পরিতোষ গ্রামের নানা কাজ করে বেড়ায়,—ছেলেটি তাদেরই একজন। সম্প্রতি গ্রামের বাউরী পাড়ার একটি নোংরা নর্দমা পরিতোষ নতুন করে কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছিল। সেই নর্দমা কাটা নিয়েই গোলযোগ বাধার সংবাদ ছেলেটি পরিতোষকে দিতে এসেছে।

সে বললে,—বাউরীরা ঠিক কাজ করছিল। আমাদের আচার্যঠাকুর তার দলবল নিয়ে এসে গোল বাধাচ্ছেন.—বলছেন, সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, নইলে একঘরে করবেন। বামুন কায়েতের ছেলে হয়ে বাউরীদের নর্দমা ঘাঁটা। আপনাকে ত' যা নয় তাই শাপমন্যি দিচ্ছেন—

পরিতোষ হেসে বললে.—তা দিনগে যান; কিন্তু ছেলেরা একটু ঘাবড়ে গেছে নাকি?

তা দু'এক জন একটু ঘাবড়েছে বৈ কি? তা ছাড়া বাউরীরা বলছে—কাজ নেই আমাদের নর্দমায়। আচার্যিঠাকুর তাদের পাপের ভয় দেখিয়েছেন, তার চাইতে বেশী দেখিয়েছেন জমিদারের ভয়। বামুন কায়েতদের ছেলেদের নিয়ে নর্দমা ঘাঁটানোর মজা তিনি দেখিয়ে দেবেন বলেছেন।

আচ্ছা চল দেখছি—বলে পরিতোষ একটু অগ্রসর হতেই দেখা গেল, গ্রামে গোঁড়া দলের পাণ্ডা আচার্যিমশাই সেই দিকেই আসছেন।

আচার্যিমশাই একটি অপরূপ চরিত্র। ফোঁটা তিলক নামাবলীর ঘটা দেখে কে বলবে তাঁর পেটে পেটে অত কুটিল কুচক্রীর বুদ্ধি। একসঙ্গে জমিদারপুত্র আর পরিতোষকে দেখে তিনি একেবারে গলায় মধু ঢেলে বল্লেন—এই যে বাবা বিজয় ভাল আছ ত', কেমন বাবা পরিতোষ সব কুশল ত'?

পরিতোষ একটু কৌতুকের হাসি হেসে বললে,—ভাল আর থাকতে দিচ্ছেন কই আচার্যিমশাই?

সে কি কথা বাবা!—আচার্য্যি মশাই একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন,—আমি ত' দিনরাত তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি, তোমরা হলে গ্রামের সব,—কি বলে রত্ন।

তাই বুঝি সকাল বেলায় আমাদের একঘরে করবার ব্যবস্থা করে এলেন?

পরিতোষের শ্লেষটা এবার বড় স্পষ্ট। আচার্যিমশাইয়ের

ধৈর্য রইল না, চেঁচিয়ে উঠলেন, একঘরে ! একঘরে আবার কাকে করবো—ওই সব হতভাগারা লাগিয়েছে বুঝি ! তা বাউরী বাগ্দীর নর্দ্দমা ঘেঁটে প্রায়শ্চিত্ত না করলে একঘরে করব না ত' কি ধূপ ধুনো দিয়ে পূজো করবো। এ সব কুমতলব ভাল মানুষের ছেলেদের যারা দেয়—

পরিতোষ নিতান্ত শান্ত স্বরে বললে, এসব কুমতলব আমিই দিয়েছি আচার্যিমশাই।

আচার্যিমশাই জ্বলে উঠলেন, তুমি দিয়েছ—তুমি কেন দিয়েছ শুনি? সব ধিঙ্গি হয়ে পল্লীমঙ্গল করে' বেড়াচ্ছেন। গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা ত' এমনি খেয়েছ, তাদের জাত-জন্মগুলো না খেলে আর চলছে না ! বামুন-কায়েতের ছেলেদের দিয়ে নর্দমা ঘাঁটানো !

পরিতোষ তবু শান্ত অবিচল। একটু হেসে বললে—বামুন কায়েতের ছেলেরা নর্দমা ঘাঁটে নি, নর্দমা বাউরীরা নিজেরাই কাটাচ্ছে। কিন্তু বামুন-কায়েতদেরও এটা সমান প্রাণের দায় তা জানেন ; জানেন গ্রামের যে ভাল পুকুরটার উপর সকলের ভরসা বাউরীদের নোংরা জল সেখানে এসে পড়ে বলেই এই নর্দমা কাটাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার চেয়ে বাউরীদের নোংরা জলে গাঁয়ে রোগ লাগলেই বুঝি ভাল হ'ত।

রোগ—রোগ অমনি লাগলেই হল। আচার্যিমশাই খেঁকিয়ে উঠলেন,—বৃহৎ জলে দোষ নেই—এই হল শাস্ত্রের কথা। আর লাগলেই বা রোগ, তাই বলে জাত-জন্ম খুইয়ে অস্পৃশ্যদের নর্দমা ঘাঁটতে হবে? আমায় আর ন্যাকা বুঝিও না বাপু। তোমার কি বলনা তিন কুলে কেউ নেই, তোমার জাত গেলেই বা কি আর থাকলেই বা কি? কিন্তু এসব অনাচার আমরা গ্রামে থাকতে হতে দেব না এই বলে রাখলাম। মনে রেখো এখনও ঠাকুর দেবতা জাগ্রত, আচার্যি ঠাকুর এখনও মরে নি।

আচার্যিমশাই একেবারে আগ্‌শর্মা হয়ে চলে গেলেন।

বিজয় পরিতোষের দিকে চেয়ে দুঃখের হাসি হেসে বললে—গ্রামের জন্যে প্রাণ দেওয়ার এই ত' প্রতিদান। যাদের ভালর জন্য এত করছ তারাই তোমায় অভিসম্পাত দিয়ে যাচ্ছে।

পরিতোষ খানিক চুপ করে রইলো, তারপর বললে,—নিজের ভাল এরা বোঝে না বলেই ত' এদের ছেড়ে দেওয়া যায় না ভাই—যাকগে তুমি আর এসব ভেবে দুঃখ পাও কেন? তোমার ছুটিও ফুরিয়েছে, আজ কালের মধ্যেই বোধ হয় চলে যাবে।

বিজয় হঠাৎ কেমন যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ে বললে,—না, ভাবছি দু' একদিন থেকেই যাব।

বিজয়ের একটু লজ্জিত বোধ করবার কারণ ছিল। ক'দিন ধরে গ্রামে একঘেয়ে জীবন অসহ্য লাগায় সে রোজই যাই-যাই করছে, নেহাৎ তার মায়ের অনুরোধেই তাকে কটা দিন থেকে যেতে হয়েছিল। এখন হঠাৎ যে কারণেই হোক, গ্রামে আরো কয়েকদিন থাকার ইচ্ছে তার হয়েছে। সে ইচ্ছের কথা জানাতে একটু সঙ্কোচ ত' হবারই কথা। তার অবস্থাটা বেশী অস্বস্তিকর হয়ে উঠল বাড়ীতে ফিরে। তার এই নতুন সঙ্কল্পের কথা মা জানেন না। বিজয় বাড়ীতে ফিরতে প্রতিদিনের মত তিনি আর একবার অনুরোধ করলেন,—দু' একদিন আর থেকে গেলে হত না বাবা।

বিজয়ের হল মহাবিপদ, সোজাসুজি মার কথায় রাজী হতেও লজ্জা হয়, অথচ আপত্তি জানাবারও উপায় নেই।

বিজয়ের বোন মাধবীও মার সঙ্গে দাদার ঘরে এসেছিল জিনিস পত্র গুছিয়ে দিতে। একে হাসি খুশি আমুদে মেয়ে তার উপর বিজয়ের সঙ্গে পিঠোপিঠি বলে, দাদা বলে সমীহ সম্মান সে বিশেষ করে না। সে তৎক্ষণাৎ ফোড়ন দিয়ে বললে—কেন মুখ ব্যথা করছ মা, দাদা এখন শহুরে হয়ে গেছে, এই গাঁয়ে এখন আর ভাল লাগে! এখানে কোথায় স্ট্রাণ্ড, কোথায় চৌরঙ্গি—একটা লেকও ছাই নেই।

বড্ড ফাজলামি হচ্ছে মাধবী!—ছোট বোনকে শাসিয়ে মার

কাছে বিজয় নালিশ জানালে,—জান মা বিয়ে হবার পর থেকে মাধবীর আস্পর্দ্ধা বড় বেড়েছে। ও আমায় দাদা বলে মানতেই চায় না।

মাধবী অম্লান বদনে বললে,—তুমিও তা' হ'লে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেল না তা হলেই আবার মানব।

বিজয় তাচ্ছিল্যের ভাণ করে বলল,—তোর মানবার জন্যে ত' আর আমার ঘুম হচ্ছে না যে বিয়ে করতে যাব।

ভাই বোনের তর্ক থামিয়ে মা হেসে বললেন—আচ্ছা তোকে এখন করতে হবে না। কিন্তু কালই তোর না গেলে নয়, এখনও ছুটি ত' তোর আছে।

বিজয় যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বললে,—তা ত' আছে।

মা আগ্রহ সহকারে বললেন—তবে কেন এত তাড়াতাড়ি যাবার জন্য জেদ করছিস বাবা, এই ত' এতদিন বাদে এলি, থাক না আর দু'দিন।

নিতান্ত যেন দায়ে পড়ে বিজয় বললে,—আচ্ছা বলছ যখন তখন—

কিন্তু মাধবীকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না, সে সবিস্ময়ে বললে,—তুমি যে অবাক করলে দাদা, হঠাৎ এমন সুমতি ত' ভাল লক্ষণ নয়! এই না গাঁয়ে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলে।

বিজয় গম্ভীর হবার চেষ্টা করে' বলেন—মা যখন অত করে' বলছেন।

তা হ'লে মা আর যেটা বলছেন, সেটাও সুবোধ ছেলের মত করে ফেল না। বিয়েটা যদি—

মাধবীর কথার মাঝেই বিজয় ফোঁস করে উঠল,—দেখ মা মাধবীকে মানা করে' দাও। ফের যদি বিয়ে বিয়ে করে' জ্বালাতন করে, তা হলে কিন্তু আমি থাকতে পারব না।

না—না জ্বালাতন করবে না। তোর ইচ্ছে না থাকলে আমরা আর জোর করে' কি করব!—বলে কোন রকমে বিজয়ের

কলকাতা যাওয়াটা বন্ধ করার খুশিতেই মা ঘর থেকে চলে গেলেন।

বেশ, দেখব তোমার এ ভীষ্মের পণ কতদিন থাকে! বলে মাধবীও ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল। বিজয় একটু ইতস্ততঃ করে, তাকে ডেকে বললে—শোন্ মাধবী।

মাধবী ফিরে এসে দাঁড়াল, কিন্তু বিজয় পড়ল দারুণ বিপদে। আসল কথাটা কি ভাবে এখন পাড়া যায়। মাধবী অবস্থাটা বোধ হয় একটু অনুমান করে' বললে, কি বলছ?

বিজয় আমতা আমতা ক'রে বললে, হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম, ওঃ—মনে পড়েছে। হ্যাঁ রে—সেই ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী আসত তোর খেলার সাথী, কি যেন মেয়েটার নাম, মনে পড়ছে না।

খেলার সাথী তখন ত কত আসত, বেলা, সুরমা, ললিতা—

বিজয় অধৈর্য হ'য়ে বললে,—না—না অন্য কি একটা নাম, আর তার সঙ্গে তোর খুব ভাব ছিল।

মাধবীর চোখে মুখে এবার কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল,—ব্যাপারটা কি বল দেখি দাদা, তাদের কাউকেই মনে মনে ঠিক করেছ নাকি? তা এ কথাটা আগে বলতে হয়। মাকে বলি এখনি।

বিজয় চটে উঠল,—ওই জন্যেই ত' কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তুই এমন ফাজিল হয়েছিস।

আচ্ছা—আচ্ছা আর ফাজলামি করব না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল ত' নির্ম্মলার। আমাদের পুরুতমশায়ের মেয়ে।

বিজয় যতদূর সম্ভব নির্ব্বিকার থাকার ভাণ করে বললে,—হ্যাঁ—হ্যাঁ নির্ম্মলা।

ও, নির্ম্মলা নামটাই ভুলে গেছলে!—মাধবীর চোখে দুষ্টুমির হাসি। আমার চেয়ে তোমার সঙ্গে বুঝি ভাব কম ছিল? ছেলেবেলা তাদের বাড়ীতেই ত কাটাতে!

আহা তাইত বলছি। তার সঙ্গে তোর দেখা টেখা হয় না ?

আমি শ্বশুরবাড়ী চলে যাওয়া অবধি, আর তেমন হয় কই।

দেখা তুই না করলে হবে কোত্থেকে, নইলে এই পাশের গাঁয়ে—বলেই বিজয় বুঝল মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।

মাধবী আঙুল নেড়ে শাসিয়ে বললে,—দাদা এবার ত ধরা পড়েছ !

ধরা—ধরা বাঃ ধরা কিসের।—বিজয় যেন বিশেষ বিরক্ত !

কিন্তু মাধবীকে অত সহজে ঠকান যায় না. বললে,—নির্ম্মলারা পাশের গাঁয়ে উঠে গেছে কেমন করে জানলে তুমি ? তা'হলে নিশ্চয় খোঁজ নিয়েছ।

বিজয় অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—না, না, এই মানে সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কিনা।

আর শুনছি না কোন কথা। আমি ঠিক বুঝেছি তখনই, ভেতরে একটা কিছু আছে ; নইলে হঠাৎ গাঁয়ের উপর তোমার এত টান পড়ে।···আমি এখনি বলছি মাকে। বড্ড আমায় বিয়ের কথায় ধমক দেওয়া হয়।

বিজয় এবার কাতর হয়ে বললে,—এই মাধবী—দোহাই তোর সত্যি বলছি তোকে এবার কলকাতা থেকে···একটা—তুই যা চাস এনে দেব।

মাধবী কিন্তু নির্ম্মম।—এর ওপর আমায় ঘুষ দিতে চাচ্ছ যখন তখন ব্যাপারটা বেশ গুরুতর আমি এই চল্লাম।

মাধবী ঘরের বাইরে যেতে না যেতেই সিঁড়িতে বিজয়ের বাবা জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত রাসভারী গম্ভীর চেহারার লোক। স্নেহের ফল্গুধারা যদিও তাঁর অন্তরে কোথাও থাকে তা' হলেও বাইরে কোন আভাষ তার নেই। গ্রামের লোক থেকে বাড়ীর সবাই তাঁকে যতটা শ্রদ্ধা করে—ভয় করে তার চেয়েও অনেক বেশী। তার মুখের সামনে মুখ তুলে কথা বলবার সাহস তাঁর

ছেলেমেয়েরও নেই। বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরে ঢুকে এদিকে ওদিকে চেয়ে বলেন,—বিজয়! কই তোমার জিনিসপত্র গোছান হয়নি এখনও?

বিজয় মাথা নীচু করে সঙ্কুচিতভাবে বললে,—না, এখনও গোছান হয়নি।

একটু যেন বিরক্তির সঙ্গে বীরেন্দ্রনারায়ণ প্রশ্ন করলেন,—কেন?

বিজয় কোনরকমে সাহস সঞ্চয় করে জানালে,—ভাবছিলাম এখনও ছুটি আছে। আরো দুচার দিন যদি এখানে থাকি।

বীরেন্দ্রনারায়ণকে কিন্তু অসন্তুষ্ট হতে দেখা গেল না, বললেন,—বেশ ভাল কথা, তোমার পড়াশুনার ক্ষতি না হলেই হল।

বিজয় এবার সাহস করে বললে—এখানে নির্জনতায় পড়াশুনার সুবিধেই হচ্ছে।

খুব ভাল কথা—বলে বীরেন্দ্রনারায়ণ চলে গেলেন।

মাধবী একেবারে চলে যায়নি। বাইরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাদায় করুণ অবস্থাটা উপভোগ করছিল। বাবা যেতেই সে ঘরে ঢুকে দাদার গলা নকল করে ব্যঙ্গ স্বরে বললে,—এখানে নির্জনতায় পড়াশুনোর সুবিধে হচ্ছে এবং তার চেয়ে সুবিধে হচ্ছে নির্মলার সঙ্গে দেখা করার।

বিজয় ফিরে তাকিয়ে শাসন করবার আগেই দেখা গেল মাধবী এ তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে।

মাধবী কিছু মিথ্যে বলেনি। পরের দিন সকাল বেলা বিজয়কে নির্মলাদের বাড়ীর কাছেই ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। নেহাৎ আকস্মিকভাবেই বোধ হয় নির্মলার সঙ্গে তার দেখাও হয়ে গেল। নির্মলা তখন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে একটি বেলগাছ থেকে পূজার জন্য বিল্বপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত, বিজয়কে সে দেখতে পায় নি। বিজয় নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে,—আমি তুলে দেব?

নির্মলা চমকে ফিরে তাকিয়ে একেবারে অবাক।—তুমি ?

দেখে আশ্চর্য হলে নাকি ?—বিজয় হাসল।

নির্মলা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, গম্ভীর হয়ে বললে,—তা একটু হলাম।

কেন বলত ? আমার এখানে বেড়াতে আসা এমন একটা নূতন কিছু ?

নির্মলা বিজয়ের দিকে না চেয়েই গম্ভীরস্বরে বললে, এটা ত ঠিক বেড়াবার জায়গা নয়। গ্রামে এত ভাল জায়গা থাকতে এখানে কি কেউ বেড়াতে আসে ?

বিজয় গাছ থেকে নিজেই পাতা তুলতে শুরু করে অম্লান বদনে বললে,—ভালো-মন্দ যার যার নিজের পছন্দ ! আমার যদি এদিকটাই ভাল লাগে। অবশ্য তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও তাহলে আর আমার এদিকে আসা হয় না।

নির্মলা একবার বিজয়ের দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, আমার আবার সন্তোষ-অসন্তোষ কিসের ? আমার ত আর কেনা জায়গা নয় যে তোমাকে বারণ করব। তোমার যেখানে খুশি বেড়াতে আসতে পার।

কেনা জায়গা হলে বুঝি আমায় আসতে দিতে না !—বলে বিজয় হাসল।

তুমি বড় বাজে বক !—বলে, নির্মলা সেখান থেকে সরে যেতে গিয়ে অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে,—আর ওকি, হচ্ছে কি ? বিজয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললে, বাঃ তোমার জন্যে বেলপাতা তুলছি।

এবার নির্মলা হেসে ফেললে, বললে,—খুব ! এই বেলপাতায় পুজো হবে ? তোমার না পায়ে জুতো।

বিজয় এবার নিতান্ত অপ্রস্তুত। নির্মলাকে সাহায্য করার আগ্রহে জুতো পায়ে থাকার কথা তার খেয়াল-ই ছিল না। নিজের

বোকামিতে তার হাসি আর থামতে চায় না। নির্মলাও হেসে লুটোপুটি।

হঠাৎ এই দৃশ্যের মাঝে ধূমকেতুর মত আচার্যি মশাই-এর উদয়। আচার্যি মশাই এই দিকেই যাচ্ছিলেন, বিশেষ জরুরী কোন কাজে, কিন্তু এরকম একটা মুখরোচক ব্যাপার একেবারে অবহেলা কি করে করেন।

এই যে বাবা বিজয়! কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক, সব ভাল? এদিকে বেড়াতে এসেছিলে বুঝি! ভাল ভাল, সকালে বায়ু সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি হিতকর আর গ্রামের এ-দিকটাই, কি বলে, বেশ ফাঁকা। আর দৃশ্যও অতি মনোহর। আমাদের মা নির্মলার রোজ এদিকে পুষ্পচয়নে আসা চাই-ই।

আচার্যি মশাই হয়তো আরো কিছু বলতেন; কিন্তু ইতিমধ্যে আর একজন যে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা তিনি খেয়ালই করেন নি। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠল, আপনিও কি এদিকে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন আচার্যি মশাই?

চমকে পেছনে ফিরে তাকিয়ে আচার্যি মশাই দেখলেন, পরিতোষ তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। আচার্যি মশাই-এর প্রশান্ত মূর্তি গেল লুপ্ত হয়ে, খেঁকিয়ে উঠে বললেন, প্রাতঃ-ভ্রমণ! আমি বেরুব প্রাতঃভ্রমণে! কেন আমার কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই। কাল রাত থেকে গরুটা ঘরে ফেরেনি, ভোর ইস্তক খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলাম। আমি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি!

পরিতোষ কোন রকমে হাসি চেপে বললে, আহা চটেন কেন? প্রাতঃভ্রমণে বেরুনটা আপনার পক্ষে এত লজ্জার কথা তা কি করে জানব বলুন? কিন্তু আপনার গরু ত শুনলাম ওরা খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

খোঁয়াড়ে দিয়েছে। আচার্যি মশাই একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন,—আমার গরু খোঁয়াড়ে দিয়েছে। কোন হতভাগার এত বড় বুকের পাটা!

ওই যে হতভাগার সবজির বাগানের বেড়া ভেঙে কাল আপনার গরু ঢুকেছিল—পরিতোষ একেবারে শান্ত নির্লিপ্ত।

আমার গরু বেড়া ভেঙে বাগানে ঢুকেছিল! আচার্যি মশাই রাগে একেবারে ফেটেই পড়েন বুঝি।

পরিতোষ তবু তেমনি শান্তস্বরে মৃদু হেসে বললে,—আমরাও ত তাই অবাক হচ্ছি আচার্যি মশাই। এতবড় একটা মহাপ্রাণ পণ্ডিতের গরু হয়ে কিনা এমন দুর্মতি! পরের সবজির বাগানের দিকে কুদৃষ্টি! আপনার দৃষ্টান্তে ও বেটার কিছু ফল হল না। গো-মূর্খ তাহলে আর বলেছে কেন?

আচার্যি মশাই আর দাঁড়াতে পারলেন না। দূর থেকে তাঁর শেষ কথা শোনা গেল, আচ্ছা আমি দেখে নেব। আমার গরু খোঁয়াড়ে দেয় কোন বেটা,—নির্ব্বংশ করে ছাড়ব।

আচার্যি মশাই-এর আস্ফালনে বিজয় বুঝি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছল, নির্মলা যে ইতিমধ্যেই ফুলের সাজি নিয়ে চলে গেছে তা সে লক্ষ্যই করেনি। নির্মলা তখনও বেশী দূর যায়নি; চেষ্টা করলে হয়ত আবার গিয়ে কথা বলা যায়। কিন্তু বিজয়ের কেমন সঙ্কোচ হল বিশেষ পরিতোষের সামনে ধরা পড়াটা সে চায় না।

কিন্তু নির্মলার সঙ্গে দেখা করবার একটু সুযোগের ব্যবস্থা তার যে না করলেই নয়। রোজ অকারণে এদিকে প্রাতঃভ্রমণে আসা যায় না, ছেলেবেলার মত যখন তখন নির্মলাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হতেও বাধে। সুতরাং এদিকে আসা ও নির্মলাদের বাড়ীতে যাওয়ার একটা চলনসই ছুতো তার চাই।

ছুতো তার হঠাৎ মিলেও গেলো। পরিতোষের সঙ্গে কথা কইতে কইতে তখন দুজনে কাছের একটি অত্যন্ত নোংরা পানায় দামে মজা পুকুরের ধারে এসে পড়েছে। হঠাৎ পরিতোষকে থামিয়ে সে সাগ্রহে বললে—আচ্ছা আমার একটা কথা রাখবে?

হঠাৎ এ রকম উত্তেজনা ও আগ্রহের স্বর শুনে একটু অবাক হয়ে পরিতোষ বললে,—কি কথা শুনি আগে।

এই পুকুরটা পরিষ্কার করা যায় না? দামে পানায় মজে কি অবস্থা হয়েছে দেখছ—এই যে গ্রামে এত ম্যালেরিয়া তার মূল কোথায়? এই সব পুকুরেই ত—বিজয় রীতিমত বক্তৃতা শুরু করে দিলে।

পরিতোষ এবার হেসে বললে—তা ত সব বুঝলাম কিন্তু এ রকম হাজা মজা পুকুর ত একটা নয়। এই পুকুরটার ওপরে হঠাৎ বিশেষ করে ঝোঁক কেন?

এবার বিজয় একটু বিব্রত হয়ে পড়ল—মানে ঠিক এটা নয়, তবে কি জান, একটা থেকে শুরু করতে হবে ত। তা ছাড়া—তা ছাড়া আমি কি ঠিক করেছি জান? আমি গ্রামে একটা সাঁতারের ক্লাব করে দিতে চাই। তোমরা যদি এ পুকুরটা পরিষ্কার করে ফেল আমি নিজেই সাহায্য করব।

পরিতোষ তার পিঠ চাপড়ে বললে,—ভাল কথা, কিন্তু সাহায্য মানে শুধু টাকার সাহায্য নয়—আমাদের সঙ্গে জলে নামতে হবে, পারবে?

বিজয় সোৎসাহে জানালে—বাঃ পারব না, আমি ত জলে নামতেই চাই।

বিজয়ের পুকুর পরিস্কারের উদ্দেশ্য যাই থাক সঙ্কল্পটা আন্তরিক।

পরের দিন সকাল বেলাই পরিতোষের দলবলের সঙ্গে তাকে সত্যই সেই পুকুরের ধারে হাজির হতে দেখা গেল। কিন্তু তখন সেখানে সেই পুকুর নিয়ে দুই সরিকের মধ্যে রীতিমত একটা খণ্ড-যুদ্ধ বেধেছে। দুই সরিকের সম্বন্ধটা অতি নিকট। খুড়ো আর ভাইপো। কিন্তু তাদের ঝগড়ার ধরন দেখে কে তা অনুমান করবে।

খুড়ো বুঝি আগে এসে পুকুরে জেলে দিয়ে জাল ফেলেছিলেন। শোনা গেল তিনি বংশীকে নির্দেশ দিচ্ছেন—আর একটু ডান দিক ঘেঁসে জাল ফেল বংশী। নইলে কি মাছ সেধে ডাঙ্গায় উঠে আসবে?

কিন্তু বংশী জাল বাগিয়ে ধরবার আগেই দেখা গেল পুকুরের আরেক পাড়ে বংশদণ্ড হাতে ভাইপো গণেশলাল মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে বংশদণ্ড আস্ফালন করে সেখান থেকেই সে শাসাচ্ছে—খবরদার বলছি বংশী ! জাল এদিকে ফেলেছিস কি তোর জালের আমি দফা-রফা করেছি।

বেচারা বংশী সভয়ে জাল হাতে নিয়ে খুড়োর মুখের দিকে চাইল। তিনি ভাইপোকে উদ্দেশ করে বললেন,—আমি ফেলছি জাল আর তার দফা-রফা করবি তুই ! তারপর বংশীকে হুকুম দিলেন,—ফেল তুই বংশী, ফেল ডান দিক ঘেঁসে, দেখি হারু চক্কোত্তি থাকতে কে তোর জালের দফা-রফা করে। জ্যান্ত এই পুকুরে পুতে ফেলবো না !

বংশী দুজনের আস্ফালনের মাঝে পড়ে সভয়ে জানালে,—আজ্ঞে আমি গরীব মানুষ।

গণেশলাল বাঁশ হাতে করে তখন একেবারে এ-পাড়েই এসে হাজির হয়েছে। খুড়াকে শাসিয়ে বললে,—এখনো ভাল কথায় বলছি কাকা বুঝে সুঝে জাল ফেল নইলে খুড়ো বলে আর মানব না বলে রাখলাম।

খুড়ো ক্ষেপে উঠলেন,—মুখ সামলে কথা বলবি গণশা ! বুঝে সুঝে জাল ফেলব মানে ?

আলবৎ বুঝে-সুঝে ফেলবে। জানো এই পুকুরের আমি দস্তুর মত সাড়ে তিন আনার সরিক। গণেশলাল পিছু হঠবার পাত্র নয়।

কাকে সাড়ে তিন আমার সরিক দেখাচ্ছিস ! জানিস দস্তুর মত পৌনে পাঁচ আনা আমার !

গণেশলাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে,—জানি, জানি। তা পৌণে পাঁচ আনা হিসাব করে জাল ফেল না। কেউ ত কিছু বলছে না।

হিসেব করে ফেলব মানে ?

আলবৎ হিসেব করবে। তোমার পৌনে পাঁচ আনার মাপ হল

বার হাত এক বিঘৎ তিন আঙ্গুল। তার এক চুল এগিয়েছে কি আমি দেখছি।

এবার হারু চক্কোত্তি আগুন হয়ে উঠলে,—জল মেপে আমায় জাল ফেলতে হবে! এ তোর বাবাকেলে একলার পুকুর পেয়েছিস।

যেমন খুড়ো তেমনি ভাইপো; গণেশলাল তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে,—বাপ তুলো না বলছি কাকা. তোমার বাপের নাম তাহলে ভুলিয়ে দেব বলে রাখছি।

পরিতোষ বিজয় প্রভৃতি এতক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এবার পরিতোষ বাধা না দিয়ে পারলে না, হেসে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি হারু-খুড়ো! সকাল বেলায় খুড়ো ভাইপোতে এত প্রেম কিসের?

হারু চক্কোত্তি একজনকে মধ্যস্থ পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। বললেন—শোন. শোন তোমরা। ওই হতভাগা ষাঁড়ের গোবর আমায় বাপ তোলে,—আমি ওর আপন খুড়ো।

পরিতোষ হেসে বললে—আহা আপনার বাপ ত ওরই ঠাকুরদা, নিজের ঠাকুরদাকে একটু তুলে ধরেছে এ আর এমন কি অন্যায় করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি নিয়ে একটু শুনতে পাই কি।

হারু চক্কোত্তি বুঝিয়ে দিলেন,—এমন কথা কেউ কখনও শুনেছ—আমায় বলে কি না জল মেপে জাল ফেলতে হবে।

গণেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার গর্জে উঠল,—মাপতে হবে না ত কি! পুকুর ত তোমার একলার নয়!

আবার খুড়ো ভাইপোয় বুঝি লাঠালাঠি বাধে। পরিতোষ দুজনকে সরিয়ে দিয়ে বললে,—আহা থামুন থামুন, একটা কথা শুনবেন আমার পুকুরের মাপ নিয়ে মারামারি করবার আগে পুকুরটা সাফ করবার একটা ব্যবস্থা করলে হয় না। কি অবস্থা হয়েছে পুকুরটার দেখেছেন?

হারু চক্কোত্তি বিরক্তির স্বরে বললেন, দেখেছি। কিন্তু আমি

করব কি ? আমি পুকুর সাফ করি আর ওরা মজা মারুক কেমন ? সেটি হচ্ছে না বাবা।

পরিতোষ এবার হেসে ফেললে, তাত বটেই, নিজের ক্ষতি হয় হোক, কারুর উপকার কিছুতে না হয়। কিন্তু পুকুর আপনাদের সাফ করতে হবে না, আমরাই সেটা করে দিচ্ছি, তারপর আপনারা মাপ-জোক ভাগ-বাটোয়ারা করবেন।

হঠাৎ এই প্রস্তাবে প্রথমে দুজনেই হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ একেবারে চুপ। তারপর খুড়ো ভাইপোতে আর বিশেষ মতভেদ নেই দেখা গেল।

খুড়ো খেঁকিয়ে উঠলেন,—তার মানে ? তোমরা পুকুর সাফ করবে কি রকম ?

ভাইপো তাতে যোগ দিয়ে বললে,—আমাদের পুকুর তোমরা সাফ করবে মানে—

পরিতোষ যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বোঝাতে চেষ্টা করলে,—পুকুরটা আপনাদের, কিন্তু গাঁয়ের স্বাস্থ্যের দায় আমাদের সকলের। আপনারা যখন হাত দেবেন না তখন আমাদেরই সাফ করতে হবে।

খুড়ো ভাইপো সব বিরোধ ভুলে এবার একেবারে এক দলের দলী হয়ে পড়লেন। গণেশ হেঁকে উঠল,—কিছুতেই না, কখ্খনো না. আমাদের পুকুর হেজে যাক মজে যাক্ তোমাদেব কিহে বাপু—কি বল কাকা ?

হারু চক্কোত্তি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে জানালেন, নিশ্চয়ই। ভারী সব গ্রামের হিতৈষী এসেছে, পুকুর সাফ করে গাঁয়ের স্বাস্থ্য ভাল করবেন। আমাদের পুকুর অমরা যেমন খুশী নোংরা করে রাখব। কি বলিস গণশা ?

আলবৎ ! আমাদের পুকুর আমরা পচিয়ে দেব।—গণেশ এখন খুড়োর সঙ্গে একেবারে একাত্মা !

যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হওয়া আচার্যি মশাই-এর একটা বিশেষত্ব। তিনি কখন এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ দেখেনি। এবার

গোলোযোগটা বেশ পাকিয়ে উঠেছে দেখে প্রসন্ন হাসি হেসে এগিয়ে এসে বললেন,—এইত আমি উপস্থিত। বিষয়টা আমি অবিলম্বে মীমাংসা করে দিচ্ছি।

কিন্তু পরিতোষের আর তখন ধৈর্য নেই। সে ধমক দিয়ে বললে—থাক বিষয়টা কাউকে মীমাংসা করতে হবে না। আমরা পুকুর পরিষ্কার করবই। আপনারা যা পারেন করুন গে যান!

সেই সঙ্গে ছেলেদের সে হুকুম দিলে,—তোমরা লেগে যাও! ছেলেদের আর দুবার বলতে হয়! তারা তখন জলে নেমে গেছে। এই ছেলের দলের বিরুদ্ধে আপাতত কিছু করতে খুড়ো ভাইপো কারুরই সাহসে কুলোল না। কিন্তু তবু পরিতোষকে একবার শাসিয়ে তারা বললে,—কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না বলে দিচ্ছি।

পরিতোষ তার জবাব পর্যন্ত না দিয়ে সরে গেল, আচার্যি মশাই একবার শেষ চেষ্টা করে বিজয়ের কাছে নালিশ জানালেন,—এই যে বাবা বিজয়। তুমি এখানে উপস্থিত থাকতে এমন একটা অন্যায় অত্যাচার!

কিন্তু বিজয়ের কাছেও সুবিধে হল না—অন্যায় অত্যাচার ত কিছু হচ্ছে না আচার্যি মশাই। বরং নিখরচায় আপনাদের পুকুর পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তাতে আপনাদের আপত্তিটা কিসের?—বলে সেও পুকুরে নেমে গেল।

পাড়ে দাড়িয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে গণেশ বললে—এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে নয় আচার্যি মশাই।

হারু চক্কোত্তি হাত-পা নেড়ে বললেন—আমি থানা পুলিশ না করে ছাড়বো না!

কিন্তু আচার্যি অত সহজে বিচলিত হন না। তাঁর বুদ্ধি আরো গভীর রাস্তায় চলে। তিনি একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন—অত ব্যস্ত নয়, ব্যস্ত নয়, সময়ে সব হবে শুধু কিঞ্চিৎ ধৈর্য প্রয়োজন। ভেতরে গভীর রহস্য আছে একটা। সেই মূল ধরে নাড়া দিতে হবে।

আচার্যি মশাই-এর মনটা কুটীল কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাঁর অনুমানটা একেবারে ভুল নয়। বিজয়ের পুকুর পরিস্কারের আগ্রহটা নেহাৎ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ যে নয় খানিক বাদেই সেটা যেন টের পাওয়া গেল। বিজয় আর সকলের সঙ্গেই জলে নেমেছিল পুকুর সাফের কাজে। হঠাৎ হাতের একটা আঙ্গুল অন্য হাতে চেপে ধরে দেখা গেল সে পাড়ে উঠে পড়েছে।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলে.—কি হল কি বিজয়-দা ?

আঙ্গুলটা কেটে গেল ভাই। আসছি এখুনি বেঁধে—বলে বিজয় আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেখান থেকে উধাও।

খানিক বাদেই তাকে দেখা গেল। একেবারে নির্মলাদের বাড়ির উঠানে।

বির্মলা ! নির্মলা ! শীগগীর !

নির্মলা হঠাৎ বিজয়ের এ-রকম ডাক শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।—কি হয়েছে কি ?

শীগগীর একটা কিছু নিয়ে এস—ভয়ানক কেটে গেছে। বিজয় তখনও আঙ্গুলটা চেপে ধরে আছে।

নির্মলা অস্থির হয়ে উঠল—কেটে গেছে ! তাড়াতাড়ি কাছে এসে আঙ্গুলটা ধরে সে বললে, কই কোথায় কেটেছে দেখি।

আঙ্গুলটা দেখার পর মুখের ভাব কিন্তু তার বদলে গেল—হুঁ খুব কেটেছে ত !

বিজয় রীতিমত গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বললে,—এখন রক্তটা বন্ধ হয়েছে তাই বুঝতে পারছ না !

নির্মলার মুখও রীতিমত গম্ভীর—খুব বুঝতে পারছি কিন্তু এখানে ত তেমন কোন ওষুধ নেই।

বিজয় তাড়াতাড়ি বললে,—না না ওষুধের দরকার হবে না, তুমি একটু বেঁধে দাও না তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বেশ তাই দিচ্ছি।—নির্মলা ঘরে গিয়ে একটা কাপড়ের ফালি

এনে যেমন তেমন করে একটু জড়িয়ে দিয়ে বললে,—নাও বাঁধা হয়েছে।

বিজয় হতাশ-স্বরে বললে,—এর মধ্যে বাঁধা হয়ে গেল। ভাল করে বেঁধেছ ত?

এবার নির্মলার মুখে না হোক চোখের হাসি চাপা রইল না, বললে,—মিছিমিছি আর ওর চেয়ে ভালো করে বাঁধা যায় না।

মিছিমিছি! বিজয় একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ল!—তুমি বল কি নির্মলা, তোমার একটু মায়া দয়া নেই! এই একটা আঁচড় থেকে কত কি হতে পারে জান? দস্তুর মত সেপটিক্ হয়ে উঠতে পারে।

কি করে আর জানব বল।—নির্মলা একটু হেসে বললে,—আমি ত আর ডাক্তারি পড়ি না। কিন্তু পুকুর সাফ করতে হাত কাটে কি করে? জলে খুব ধার বুঝি!

তাহলে তুমি আমার আঙ্গুল কাটা বিশ্বাস কর না।—বিজয় এখনও গম্ভীর।

নির্মলাও হাসি চেপে বললে, বিশ্বাস করছি না আবার, খুব বিশ্বাস করছি—আমি শুধু ভাবছি—

ভাবছ আবার কি?

না এই ভাবছি এর পর নূতন কি ছুতো খুঁজে বার করবে—পিপাসা হয়েছে, পান খাওয়া হয়েছে, আঙ্গুলও কেটেছে, তারপর?—বলে নির্মলা আর হাসি চাপতে পারলে না।

বিজয়ও প্রথমটা হেসে ফেলেছিল,—তারপর যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে রাগের সঙ্গে বললে—তুমি তাহলে মনে কর আমি ছুতো করে তোমায় দেখতে আসি? তুমি মনে কর পুকুর পরিষ্কার করতে আসা, আমার একটা ছল—তোমার ধারণা তোমায় না দেখে আমি থাকতে পারি না?

বিজয়ের গম্ভীর স্বরে সত্যি একটু অবাক হয়ে নির্মলা তার দিকে তাকাতেই বিজয় কাছে এসে হঠাৎ সুর পাল্টে মৃদু হেসে

বললে,- সত্যি তাই নির্মলা. সত্যি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কি করে এমন হল !

নির্মলা এবার মুখ ফিরিয়ে নিলে। বিজয় পাশে গিয়ে বসে বললে, তুমি রাগ করলে নির্মলা ?

না রাগ করব কেন, কিন্তু এ ভাল হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে অনেক তফাৎ, আমাদের দূরে থাকাই উচিত !—নির্মলার স্বর এবার সত্যি সত্যি গম্ভীর, যেন প্রচ্ছন্ন বেদনায় ভারী।

এ উচিত-অনুচিত কার দিক থেকে বিচার করছ নির্মলা ?—বিজয়ের গলায় এবার সুস্পষ্ট ধ্যাকুলতা।

সকলের দিক থেকে—সব দিক থেকে আমাদের মধ্যে বাধা !

বিজয় উত্তেজিত স্বরে বলে,—সব দিকের কথা পরে ভাবব, তোমার নিজের দিকটা আগে শুনি। তোমার নিজের মনে যদি অবশ্য বাধা থাকে···

আমার কথা কি তুমি জান না—কিন্তু আমার কথায় কি আসে যায় ! নির্মলা এবার চোখ তুলে তাকাল বিজয়ের দিকে, সে চোখে আসন্ন অশ্রুর গাঢ় ছায়া।

বিজয় তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলে,—তাইতেই যা কিছু আসে যায় নির্মলা ! আর কোন দিক থেকে কোন বাধা আমি মানি না, মানব না।

একটু থেমে সে আবার বললে,—আজই তোমার কাছে কোন শেষ উত্তর আমি চাই না নির্মলা। কিন্তু জেনো সে উত্তর একদিন আমি নেবই।

বিজয় নির্মলার মুখের দিকে না তাকিয়েই বেরিয়ে যায়।

পুকুর পরিস্কার তারপর নিয়মিতভাবে চলতে থাকে. সেই অজুহাতে বিজয়ের নির্মলার সঙ্গে দেখা-শুনারও বিশেষ অসুবিধা হয় না। এবং একদিন নির্মলার হৃদয়ের উত্তর আর গোপন রাখা যায় না।

নির্মলা দুর্ব্বলভাবে বিজয়কে এখনও বোঝাতে চেষ্টা করে,—

কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না চারিদিকে কত আমাদের বাধা। তুমি যা ভাবছ, তা হবার নয়!

মুখে বললেও বোঝা যায় নির্মলার মন তার নিজের অজ্ঞাতে কখন দুর্বল হয়ে এসেছে।

বিজয় জোর করে বলে,—তুমি বাধাগুলো বড় বেশী করে দেখছ নির্মলা। আর বাধা যতই হোক হার মানব কেন? শুধু তুমি একবার সায় দাও।

নির্মলা বিজয়ের দিকে একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নেয়। বিজয় আবার বলে,—তুমি পাশে থাকলে আমি সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি নির্মলা। কিন্তু তার দরকার হবে না। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুধু মত দাও, আমি মাকে জানাই।

নির্মলা মাথা নিচু করেই বলে—বেশ! আমার আর কিছু বলার নেই।

আচার্যি মশাই ও তাঁর দলবল পুকুর পরিষ্কারের কাজে তারপর আর কোন বাধা দেন নি। কিন্তু তাই বলে তাঁরা চুপ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। বিজয় ও নির্মলার মেলা-মেশার ব্যাপারটা আচার্যি মশাই ভালো করেই লক্ষ্য করেছেন। এবং একদিন তাঁকে দলবল সমেত একেবারে জমিদারের কাছারিতে উপস্থিত দেখা যায়। জমিদার-মশাই তখনও আসেননি। জমিদারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ সরকার মশাইএর কাছেই আচার্যি মশাই ভূমিকাটা সেরে রাখেন। শোনা যায় আচার্যি মশাই বলছেন,—সব নিপর্যয়ের মূল ঐ মেয়েটা। ওরই জন্যই এত গণ্ডগোল।

সরকার মশাই লোকটি একটি দুর্বোধ্য। তাঁর কথাবার্তার অর্থ সব সময়ে ঠিক পরিষ্কার বোঝা যায় না। মনে হয় লোকটির বাইরের পরিচয়ের পেছনে আর একটা মানুষ লুকিয়ে আছে। স্বয়ং জমিদারমশাইও যেন তাঁকে একটু সমীহ করে চলেন।

সরকার মশাই বলেন,—বটে, তাই নাকি? মেয়েটাই তাহলে আপনার মতে যত নষ্টের গোড়া।

আচার্যি মশাই উৎসাহিত হয়ে বলেন,—আমার মতে ত তাই। শুধু আমার মতেই বা কেন? এই ত এরা এখানে উপস্থিত, এদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না!

হারু চক্কোত্তি ও গণেশলাল দু'জনেই সেখানে উপস্থিত। সায় দিয়ে বলে,—আজ্ঞে হাঁ! কি মোহজালই না বিস্তার করেছে।

শশিভূষণ গম্ভীর স্বরে বলেন,—অর্থাৎ সহজ ভাষায় চালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এমন দেবতুল্য ভাল মানুষ পুরুত ঠাকুরের মেয়ে কি না···

আচার্যি মশাই শশীভূষণকে কথাটা আর শেষ করতে দেন না, বলে ওঠেন,—শোন সরকার মশাইয়ের কথা, পুরুত ঠাকুর ভাল মানুষ বলে··

গণেশলাল তাঁর ওপর ফোড়ন দিয়ে বলে—হ্যাঁ, গোবরে পদ্মফুল কি হয় না?

সবাই এই অপূর্ব উপমায় স্তম্ভিত।

আঃ, তুমি থাম দেখি গণেশ! উপমা অমনি প্রয়োগ করলেই হ'লো নাকি?—আচার্যি মশাই গণেশলালের নির্বুদ্ধিতায় না চটে পারেন না। গণেশলালের মূর্খতা মাঝে মাঝে সত্যিই মারাত্মক।

শশীভূষণ একটু হেসে বলেন,—কেন আচার্যি মশাই, উপমাটা মন্দ কি? পদ্মফুলের লোভেই না সব অলি এসে জুটেছে।

গণেশলাল খুশী হয়ে মাথা নাড়ে। শশীভূষণ আবার বলেন, কিন্তু এই অলিগুলি পদ্ম ছেড়ে হঠাৎ আপনাদের পুকুরের পানায় নজর দিচ্ছে কেন? সেখানে ত কোন মধু নেই।

হারু চক্কোত্তি এবার তেতে ওঠেন,—সেখানে ওদের শ্রাদ্ধের

পিণ্ডি আছে। সব গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করছেন। আমাদের চার পুরুষের পুকুর ওঁরা জোর ক'রে সাফ করবেন।

আচার্যি মশাই বাঁকা হাসি হেসে বলেন,—আহা চটো কেন খুড়ো ব্যাপারটা অত সরল নয়, গভীর রহস্য আছে ভেতরে। বুঝলেন সরকার মশাই! ওদের পুকুর পরিষ্কারটা উপলক্ষ্য মাত্র।

লক্ষ্য বুঝি ঐ পদ্মটি?—শশীভূষণ হেসে বললেন,—কিন্তু নিশানাটা বড় দূর হয়ে গেল না আচার্যি মশাই? সারাদিন পুকুরের পাঁক ঘাটলে পদ্মের খবর নেবার সময় কোথায়?

আচার্যি মশাই সকলের দিকে একবার অর্থপূর্ণভাবে চেয়ে বললে,—যার খবর সে ঠিক নিচ্ছে। কি বল হে?

হারু খুড়ো সায় দেন,—তা ছাড়া আর কি?

যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,—গণেশলাল আবার উপমা প্রয়োগ করে।

আচার্যি মশাই চটে উঠে বললেন,—আঃ গণেশ।

শশীভূষণ হেসে বলেন,—আমাদের গণেশের উপমাগুলি একেবারে কালিদাসস্য! কিন্তু ঘোগটিকে চিনতে পারলুম না ত!

চিনবেন কেমন করে সরকার মশাই! সে কি সহজে চেনা যায়! আমরাই ত তাজ্জব!—আচার্যি মশাই এবার শশীর কানে কানে বলেন,—স্বয়ং আমাদের জমিদার পুত্র।

শশীভূষণের মুখে কোন বিকার দেখা যায় না। একটু হেসে তিনি বলেন—ওঃ, তাই বুঝি জমিদার মশাই এর কাছে সুসংবাদটা দিতে এসেছেন।

আচার্যি মশাই যেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেন,—আমাদের একটা দায়িত্ব বোধ ত আছে। অমন একটা হীরক খণ্ডের মত ছেলে একটা কুহকিনীর মায়ায় নষ্ট হয়ে যাবে···

সে আপনারা প্রাণ থাকতে দেখতে পারবেন না, বুঝেছি। কিন্তু জমিদারকে না জানিয়ে তার হীরক খণ্ডের মত ছেলেটিকে

কুহকিনীর মায়া থেকে উদ্ধার করা যেত না কি?—শশীভূষণের গলার স্বরে বোঝবার উপায় নেই তিনি বিদ্রূপ করছেন না সহজ কথা বলছেন।

আচার্যি মশাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—কি রকম?

শশীভূষণ ব্যাখ্যা করেন,—কুহকিনীদের শুনি শিকার পেলেই হল। তা একটা শিকার জুটিয়ে দিলেই ত হয়। এই আমাদের গণেশের মত নিরীহ নধর একটি। গণেশের বোধহয় আপত্তি নেই।

গণেশলাল হঠাৎ খুশীতে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে—আমায়? হেঃ আমায় সে আমলই দেয় না। সেদিন পুকুরের ধারে একটু ইসারায় ডেকেছি, যা ফোঁস করে উঠল। আমার সঙ্গে তার যেন সোনায় সোহাগা।

উপমার অভিনবত্বে সবাই নির্বাক!—শুধু আচার্যি মশাই হতাশ ভাবে বলে ওঠেন,—নাঃ, বাতুল, বাতুল!

শশীভূষণ হাসি চেপে বলেন,—তাইত বড় দুঃখের কথা! যাক্, তাহলে যা করবার হয় করুন। জমিদার মশাই ত এসে পড়েছেন।

জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরে ঢুকে অতিথিদের দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের আসনে বসে বলেন,—তারপর আপনারা কি মনে করে আচার্যি মশাই? আপনাদের দর্শন ত বিশেষ সৌভাগ্য ছাড়া পাওয়া যায় না।

আচার্যি মশাই বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে বলেন,—আজ্ঞে একটু নিবেদন ছিল।

জমিদার মশাই একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলেন,—বেশ, নিবেদন করে ফেলুন।

আচার্যি মশাই যেন অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে জানান,—দেখুন গ্রামে ত আর বাস চলে না।

তা হলে বাস তুলে দিন। বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বরে কোন সহানুভূতি দেখা যায় না।

আচার্যি মশাই একটু থমকে গেলেও হাল ছাড়েন না—কিন্তু আপনি থাকতে গ্রামের এই দুর্গতি!···

বীরেন্দ্রনারায়ণের বিরক্ত দৃষ্টির সামনে আচার্যি মশাইএর আর বাক-স্ফূর্তি হয় না। জমিদার মশাই শশীভূষণের দিকে ফিরে বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন,—ব্যাপারটা কি?

শশীভূষণ নিতান্ত যেন সরলভাবে বলেন,—ব্যাপারটা গুরুতর! ওদের কোন পচা পুকুর গাঁয়ের ছেলেরা মিলে পরিষ্কার করতে লেগেছে।

বীরেন্দ্রনারায়ণের ঠোঁটের কোনে একটু হাসির আভাস দেখা যায় সেটা চেপে তিনি বলেন,—আপনাদের তাতে বড্ড অসুবিধে হয়েছে বুঝি?

আচার্যি মশাই তাড়াতাড়ি সুর বদলে জবাব দেন,—আজ্ঞে না। পুষ্করিণী উদ্ধার ত শুভ কাজ, ভাল কাজ, আমার ত তাতে, কি বলে উৎসাহই ছিল। কিন্তু পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের নামে যদি এমন অনাচার শুরু হয়—

বীরেন্দ্রনারায়ণ ধমকে ওঠেন,—ভণিতা রেখে সোজা করে ব্যাপারটা বলুন দেখি, আর যদি না পারেন ত যান, আমায় মিছিমিছি বিরক্ত করবেন না।

আচার্যি মশাই সকাতরে জানান,—বিরক্ত কি করতাম, নেহাৎ আমাদের বিজয় এর ভেতর না থাকলে···

বিজয়! আমার ছেলে! কি করেছে সে?—জমিদার মশাই কঠিনভাবেই আচার্যি মশাই-এর দিকে তাকান!

সে দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে পড়ে আচার্যি মশাই যথাসম্ভব মধুর কণ্ঠে বলেন,—না, না, না, সে কি করবে? নিষ্কলঙ্ক, দুগ্ধপোষ্য শিশু বললেই হয়, সে ত মহৎ উদ্দেশ্যেই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করতে গেছল, সেখানে যে অমন ডাকিনী

তার মস্তক চর্বণ করবার জন্যে বসে আছে তা আর জানবে কি করে !

এবার বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে,—আচার্যি মশাই আমার ধৈর্য বেশী নয়। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।

আচার্যি মশাই সভয়ে কোন রকমে জানান,—বলব আর কি ? বলবার আর কি আছে। নেহাৎ নিজের চক্ষে দেখা তাই।

তারপর নিজে আর শেষ করতে না পেরে আর সকলকে সাহায্যে আহ্বান করেন,—কই হে বল না, তোমরাও ত দেখেছ। পুরুত ঠাকুরের মেয়ে নির্মলা না, কি নাম ছুঁড়িটার, গাছতলায় বিজয়ের সঙ্গে কি ঢলাঢলি। অতবড় আইবুড়ো সোমত্থ মেয়ে ! বিয়ে দিলে তিন ছেলের মা হত···

জমিদারমশাইএর মুখ অনেকক্ষণ থেকেই কঠিন হয়ে আসছিল, এবার তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বর শোনা যায়,—আচার্যি মশাই !

আচার্যি মশাই সভয়ে নীরব হয়ে যান। বীরেন্দ্রনারায়ণ বলেন,—আপনাদের বক্তব্য বোধ হয় শেষ হয়েছে। এখন আপনারা যেতে পারেন।

আচার্যি মশাই ও তার দলবলকে তবু ইতস্ততঃ করতে দেখে শশীভূষণ হেসে বলেন,—মানটা বজায় থাকতে থাকতেই যাওয়া ভাল নয় কি আচার্যি মশাই ?

হ্যাঁ, এই যে—আচার্যি মশাই নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই ক্ষুণ্ণ মনে দলবল সমেত বিদায় নেন। জমিদার মশাই তাদের শেষ কথা জানিয়ে দেন,—আর একটা কথা ভবিষ্যতে মনে রাখবেন ! আমার ছেলের চরিত্র নিয়ে আপনাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।

আচার্যি মশাই বা তার দলবল আর উত্তর পর্যন্ত দিতে সাহস করে না।

তাদের দল চলে যাবার পর খানিকক্ষণ ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। বীরেন্দ্রনারায়ণের গম্ভীর চিন্তানিমগ্ন মুখের দিকে একবার আড়-

চোখে তাকিয়ে শশীভূষণ নীরবে নিজের কাজ করে যান। হঠাৎ বীরেন্দ্রনারায়ণের ডাক শোনা যায়,—শশী—

শশীভূষণ মুখ ফেরায়। বীরেন্দ্রনারায়ণ তার দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর স্বরে বলেন,—পুরুত মশাইকে খবর দেবে! কাল-ই যেন এখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

কথাগুলো বলেই বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে চলে যান। শশী সে দিকে না চেয়ে একটু হাসে, তারপর খানিক চুপ করে থেকে তার হিসাবের খাতায় কি যেন কাটাকাটি করে। দেখা যায় হিসাবের অঙ্কের বদলে সেখানে লেখা আছে,—'মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখ বাঁধা বলদের মত।'

পরের দিন সকল বেলা। বিজয় তার পড়বার ঘরে টেবিলের ধারে বসে। কিন্তু সামনে বই খোলা থাকলেই কি পড়া হয়! দেখা যায়, বিজয় অন্যমনস্কভাবে কলম দিয়ে একটা কাগজে হিজি-বিজি কেটে চলেছে। হঠাৎ পেছনে মাধবীর গলার স্বর শুনে সে চমকে ওঠে।

দাদা কি পড়াশুনাই করছে রাতদিন, পড়ে পড়ে দাদার মাথাই না খারাপ হয়ে যায়।

মাধবী কখন চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বিজয় জানতেই পারে নি। তার দিকে ফিরে যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে সে বলে—করছিই ত পড়াশুনা! তোকে এখানে ফাজলামি করতে কে ডেকেচে!

ও আমি এসে পড়ায় বাধা দিলাম বুঝি? মাধবীর গলার স্বরও রীতিমত গম্ভীর। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে সে ছোঁ মেরে দাদার হাতের কাগজটা কেড়ে নিয়ে বলে,—বাঃ, চমৎকার। তোমাদের পড়ায় এ সব বুঝি আঁকতে হয়, আর আর···

যেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কাগজটা লক্ষ্য করে মাধবী বলে, —আর এই নি—র—ম—লা এই নামটাও বুঝি লিখে, জপ করতে হয়।

বিজয় এবার সত্যি ক্ষেপে উঠে কাগজটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে তীব্র প্রতিবাদের স্বরে বলে,—কক্ষণ না। কক্ষণ ওনাম ওখানে লেখা নেই।

নেই বুঝি? তা হলে আমারই ভুল। কিন্তু কাগজে না লিখে মনে মনে জপ করছিলে তো?

করছিলাম, বেশ করছিলাম, তুই এখান থেকে বেরো। রাতদিন এক বাজে কথা।—বিজয়কে রীতিমত বিরক্তই মনে হয়।

বেশ যাচ্ছি।—বলে মাধবী যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে যাবার উপক্রম করে। বিজয়কে সুতরাং নরম হতেই হয়। মাধবীই তার একমাত্র সহায়। তাকে চটানটা নিরাপদ নয়। বিজয় গলা নামিয়ে বলে, —চলে যাচ্ছিস নাকি?

বাঃ, তাড়িয়ে দিলে চলে যাব না!

না, শোন্ না। এদিকে আয়—বিজয়কে অনুরোধ করতে হয়।

কিন্তু মাধবী এখন সুবিধে পেয়েছে—দরকার কি বাবা! তোমার পড়ার ক্ষতি হবে।।

না না—শোন্ না। বিজয়কে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েই মিনতি করতে হয়।

মাধবী কাছে এলে সে এবার আসল কথাটা কোন রকমে বলে ফেলে,—আচ্ছা মনে কর যদি—এই যদি ধর—সত্যিই যদি নির্মলাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

মাধবীর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খুশীতে কিন্তু সুবিধে পেয়ে সে একটু জ্বালাতন না করে ছাড়ে? সে যেন নিতান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে,—যা, বাজে কথা!

বিজয়কে এবার সাগ্রহে নিজের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হয়, না—না বাজে কথা নয়, সত্যি বলছি বিয়ে আমি করতে পারি কিন্তু আর কাউকে নয়।

এবার মাধবী হেসে ফেলে বলে—ওই মা আসছে, মাকে বলব তা হলে?

এই না—না এখন নয়। বিজয় সন্ত্রস্ত, ভীত হয়ে ওঠে।

মাধবী আরো তাকে জ্বালাতন করবার জন্যে বলে,—কেন এখনই তো ভাল, একেবারে তোমার সামনেই কথাটা পেড়ে ফেলি না ?

না—না, দোহাই তোর, এখানে নয়—বিজয় সকাতর মিনতি জানায়, এবং হঠাৎ একটা বই টেনে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়তে বসে যায়।

মা এসে ভর্ৎসনা করে' বলেন—খাওয়া দাওয়া কি সব ঘুচিয়ে দিলি বিজয়, কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি, খাবার হুঁসই নেই।

মাধবী দাদার দিকে একবার হেসে তাকিয়ে বলে,—হুঁস কি করে থাকবে মা, দাদার এখন ·· বিজয় সভয়ে তার দিকে তাকতেই মাধবী হেসে হেসে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে,—যা এক ভাবনা ঢুকেছে মাথায়।

মাধবী শেষ পর্যন্ত বোধ হয় অপ্রস্তুত করে ছাড়বে-ই। বিজয় হতাশ হয়ে উঠে পড়ে বিরক্তির ভান করে বলে—নাও তোমরাই এ ঘরে বসে বসে গজর গজর কর। আমার আর পড়েশুনে কাজ নেই।

সে রীতিমত রেগেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শোন্ শোন্ বিজয় যাস নি,—মা উদ্বিগ্নস্বরে ডাকেন। তারপর বলেন,—সত্যি আমাদের তো অন্যায় বাপু, পড়াশুনার সময় এসে বিরক্ত করলে তো রেগে যাবেই।

মাধবী এবার হেসে ফেলে,—পড়াশুনা নয় মা পড়াশুনা নয়। দাদার এখন একটা বিয়ে দেওয়া দরকার শীগগীর।

মা দুঃখের সঙ্গে বলেন,—তাতে কি আমার অসাধ কিন্তু ও তো বিয়ের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে।

ঠিক নাম শুনলে ক্ষেপে উঠবে না। দেখবে, সুড় সুড় করে

গিয়ে ছাঁদনা তলায় হাজির হয়েছে। তুমি এখন যার তার নাম করলে রাজী হবে কেন ?

মা কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে বলেন,—মেয়ে দেখতেই রাজী না হলে ঠিক বেঠিক কি করে বুঝব বাপু।

মাধবী মাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে বলে,—মেয়ে তো দেখে ঠিক হয়ে আছে—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নির্মলাকে জান তো !

আমাদের পুরুত ঠাকুরের মেয়ে ?—মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ, দাদার শুধু তাকেই পছন্দ। এখন তুমি বাবাকে বলে রাজী করালেই হ'লো। মাধবী এবার পরিহাস ছেড়ে দাদার হয়ে সত্যিই ওকালতি করে বলে,—সত্যি মা, নির্মলা ভারী ভাল মেয়ে। বাবাকে তোমায় বলতেই হবে।

বলব'ত কিন্তু উনি কি রাজী হবেন ?—মার মুখ একটু যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

মাধবী তবু জেদ করে,—কেন রাজী হবে না মা, নির্মলার মত বৌ তোমরা কোথায় পাবে ? তা ছাড়া দাদার যখন এ রকম পছন্দ।

মা হতাশ ভাবে বলেন,—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমাদের চেয়ে নীচু ঘরের—পুরুতের মেয়ে উনি কি আনতে চাইবেন। ওঁর মতামত তো জানিস।

মাধবী এবার রেগে ওঠে,—গরীব বলেই কি ঘর ছোট হয় মা, ঠাকুরের পুজো যার হাতে হয়, তার মেয়ে ঘরে আনবার যোগ্য নয় ?

এসব কথা আমায় বলে তো কোন লাভ নেই মা, আমি ঘরও বুঝি না, বংশও বুঝি না, আমি শুধু মানুষই বুঝি। কিন্তু ওঁর কাছে বংশের মান সব চেয়ে বড়, সেখানে আর কেউ নেই, আর কিছু নেই। তবু বলে দেখব একবার,—বলে মা গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

বিজয়ের ঘরে মাধবী যখন মার কাছে দাদার হয়ে ওকালতি করতে ব্যস্ত তখন জমিদারের কাছারী ঘরে, নির্মলার বাবা, জমিদারের জরুরী তলবে এসে হাজির হয়ে বসে আছেন। জমিদার মশাই সাধারণত তাঁকে পূজা-আচ্চার ব্যাপারেও ডেকে পাঠান না। আজকের এই বিশেষ আহ্বানে পুরুত মশাই তাই একটু বিস্মিতই হয়েছেন। অনেকক্ষণ সামনে বসে থাকলেও বীরেন্দ্রনারায়ণ এ পর্য্যন্ত তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতকরবার অবসর পান নি! পুরুত মশাই নিজের উপস্থিতিটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ জমিদার মশাই কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে বলেন,—আপনি আর বসে কেন পুরুত মশাই, আপনি যেতে পারেন।

ডেকে এনে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার পর এই কথার কোন অর্থ না পেয়ে পুরুত মশাই একটু বিস্মিত ভাবে উঠে পড়ে বলেন,—আচ্ছা তাহলে আসি,—একটু ইতস্তত করে তিনি তারপর জিজ্ঞাসা করেন,—কিন্তু আমায় কি জন্যে যেন স্মরণ করেছিলেন?

ও হ্যাঁ তাও বটে, বসুন আর একটু তাহলে!—জমিদার মশাই যেন হঠাৎ ব্যাপারটা স্মরণ করে নিতান্ত সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার একটি মেয়ে আছে না পুরুত মশাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ ওই একটি মেয়ে।

মেয়ে বেশ বড় হয়েছে, বিবাহযোগ্যা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বয়স বরং একটু বেশীই হয়েছে! পুরুত মশাই জানান।

তা বিয়ে দেন নি কেন!—চৌধুরী মশাইয়ের স্বর ক্রমশই যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

পুরুত মশাই কিন্তু হেসে জবাব দেন,—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এত আমাদের হাতে নয়।

কিন্তু চেষ্টা তো আমাদের হাতে। চেষ্টা করেছেন?

তেমন কিছু নয়, সংস্থানও তো কিছু নেই।

জমিদারের মুখ আরো কঠিন হয়ে ওঠে,—হুঁ, কিন্তু বিয়ে তা বলে ত আর ফেলে রাখা যাবে না।

পুরুত মশাই চুপ করে থাকেন।

জমিদার মশাই আবার বলেন,—বয়স্থা মেয়ে অবিবাহিতা থাকলে গ্রামে নানান কথা উঠতে পারে তা তো বোঝেন।

এবার সত্যি বিস্মিত হয়ে উমানাথ বলেন,—কথা উঠবে কেন? মানুষের অদৃষ্ট আর অবস্থা নিয়ে ত আর কথা হতে পারে না।

কিন্তু কথা তবু ওঠে পুরুত মশাই। আপনি আপনার মেয়ের জন্যে পাত্র দেখুন—বীরেন্দ্রনারায়ণের কথাগুলি আদেশের মতই শোনায়। একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বলেন,—খরচের জন্যে ভাববেন না, তার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

উমানাথ এতক্ষণে যেন সমস্ত কথার একটা মানে খুঁজে পেয়ে সকৃতজ্ঞ ভাবে বলেন,—আপনার অনেক অনুগ্রহ।

পর মুহূর্তে বীরেন্দ্রনারায়ণের কথায় তাঁকে চমকে উঠতে হয় একটু। বীরেন্দ্রনারায়ণ বলেন,—একটা কথা মনে রাখবেন। এই মাসের মধ্যে আপনার মেয়ের বিয়ে হওয়া দরকার।

এই মাসের মধ্যেই! উমানাথ সত্যিই বিস্মিত। কিন্তু হঠাৎ এমন তাড়াহুড়ো করে কি পারব?

পারতে হবে পুরুত মশাই, মেয়ের বিয়ে এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। চেষ্টা থাকলে একদিনেই দেওয়া যায়।

উমানাথ সত্যি মনে মনে আহত হয়ে ম্লান হেসে বলেন,—আচ্ছা দেখি।

উমানাথ তারপর বিদায় নমস্কার করে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জমিদার মশাই তাঁকে ডেকে বললেন,—আর শুনুন, বয়স্থা আইবুড়ো মেয়ে বাড়ীতে থাকলে যার তার বাড়ীতে আসা উচিত নয়।

উমানাথ ভালো মানুষ হ'লেও নির্বোধ নয়। কথাটার তাৎপর্য বুঝে খানিক স্তম্ভিত হয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন,—

বাড়ীতে তো যে সে কেউ আসে না, চৌধুরী মশাই। কখন কখন পরিতোষ আর এই ক'দিন আমাদের বিজয়···

বীরেন্দ্রনারায়ণ উমানাথকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন,—বিজয় আমার ছেলে বলে তার কিছু সাত খুন মাপ নয় পুরুত মশাই।

উমানাথের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বার হল না। খানিক চুপ করে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ধীরে ধীরে অবসন্ন পদে বেরিয়ে গেলেন।

মাধবীর কাছে সমস্ত কথা শোনার পর থেকেই বিজয়ের মা অন্নপূর্ণা দেবী স্বামীর কাছে প্রস্তাবটা একবার পাড়বার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন। খানিক আগে পুরুত মশাই কাছারী ঘরে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জেনে তাঁর একটু কেমন ভরসাও বেড়েছিল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ কাছারী ঘর থেকে বাড়ীতে ফিরে বিশ্রাম করতে বসা মাত্র তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। ঘরে ঢুকে একটু উদ্‌গ্রীব হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন,—পুরুত মশাই এসেছিলেন না? কেন গো?

বীরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর মুখে শুধু বললেন,—ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

ডেকে পাঠিয়েছিলে? কেন বলত?

বীরেন্দ্রনারায়ণ এবার ঈষৎ হেসে বললেন,—সে খবরও তোমার দরকার?

অন্নপূর্ণা স্বামীর কাছে একটা আসনে বসে পড়ে খুশী মুখে বললেন,—তা দরকার হতে পারে না! আমি পুরুত মশাইয়ের কথাই তোমায় বলতে এলাম যে।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আলবোলায় দু'বার টান দিয়ে ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে বললেন,—তা বলে ফেল। পুজোর ঘটা একটু বাড়াবার দরকার বুঝি?

না গো না। পুরুত মশাইয়ের একটি মেয়ে আছে জান।—অন্নপূর্ণা নিজেই কথাটা এবার পেড়ে ফেললেন!

বীরেন্দ্রনারায়ণের মুখ এক মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল, বললেন,—জানি।

ভারী ভালো মেয়ে, রূপে গুণে একেবারে লক্ষ্মী।

বুঝলাম, তারপর?—বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কঠিন।

অন্নপূর্ণা কিন্তু নিজের উৎসাহে তখন অধীর, স্বামীর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য না করেই বললেন—পয়সার অভাবে পুরুত মশাই মেয়েটির এখনও বিয়ে দিতে পারেন নি।

বীরেন্দ্রনারায়ণ কঠিন স্বরে বললেন,—এবার যাতে পারেন তার ব্যবস্থার জন্যেই পুরুত মশাইকে ডেকেছিলাম।

তার জন্যে ডেকেছিলে? কি আশ্চর্য, আমি যে সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি। সত্যি আমাদের বিজয়ের সঙ্গে এতো ভাল মানাবে···

অন্নপূর্ণা উচ্ছ্বসিত ভাবে আরো অনেক কিছুই বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ স্বামীর গম্ভীর রুক্ষস্বরে তাঁর চমক ভাঙ্গল। বীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে থামিয়ে বললেন—বিজয়ের সঙ্গে মানাবার কথা কোথা থেকে আসছে? পুরুত মশাইয়ের মেয়ের বিয়ের সঙ্গে বিজয়ের কোন সম্পর্ক নেই। উনি পাত্র খুঁজবেন, আমি খরচ দেব বলেছি এই পর্যন্ত।

অন্নপূর্ণার মুখ এক মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। কোন আশা আর নেই বুঝেও তিনি শেষ চেষ্টা করে বললেন,—কিন্তু অমন ভাল মেয়ে। আমি যে বড় আশা করেছিলাম।

কিন্তু বীরেন্দ্রনারায়ণ পাহাড়ের চেয়ে কঠিন। স্ত্রীর দিকে ফিরে বেশ একটু তিক্তভাবেই তিনি বললেন,—তোমার আশা একটু অদ্ভুত। একটা কথা ভুলে যেও না যে শুধু সুন্দরী আর ভালো মেয়ে হলেই চৌধুরী বাড়ীর বৌ হবার যোগ্য হয় না।

অন্নপূর্ণা নীরবে ম্লানমুখে স্বামীর শেষ কথা শুনে উঠে

যাচ্ছিলেন, বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার তাঁকে ডেকে বলে দিলেন,—আর বিজয়কে বলে দিও, কালই যেন সে কলকাতায় রওনা হয়। তার এখানে থাকার আর প্রয়োজন নেই।

ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম আঘাত মানুষের অতি বড় আনন্দের মুহূর্তেই বুঝি আসে। মাধবী ও মায়ের কাছে আশা ও আশ্বাস পেয়ে বিজয় অত্যন্ত উৎসাহভরেই নির্মলাদের বাড়ীতে গিয়েছিল। মা একবার প্রস্তাব করলে বাবার যে অমত হবে না এ বিষয়ে এখন তার আর কোন সন্দেহ নেই। সেই বিশ্বাসের জোরেই নির্মলাকে সে গিয়ে জানালে—জানো আজ মার মত পেয়েছি, আর মা বললে বাবা যে মত দেবেন সে বিশ্বাস আমার আছে।

নির্মলার মুখে একটু ম্লান হাসি দেখে সে আবার বললে,—এখনো তোমার ভয় ঘোচেনি, না নির্মলা?

নির্মলা শান্ত স্বরে বললে,—ভয় নয়. তবে বেশী ভরসা করে দুঃখ পেতেও আমি চাই না।

বিজয় জোর দিয়ে বললে,—দুঃখ পেতে হবে না নির্মলা—

নির্মলা একটু চুপ করে থেকে বললে,—বাবা আজ তোমাদের ওখানেই গেছেন যে। জমিদার মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাবা ডেকে, পাঠিয়েছেন—বিজয় এতটা বুঝি নিজেও আশা করেনি। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললে,—আমি জানতাম নির্মলা, বাবা কিছুতেই আপত্তি করবেন না, তাঁর ওপরটাই পাথরের মত শক্ত কিন্তু ভেতরটা কত কোমল তা সকলে বুঝতে পারে না।

হঠাৎ উমানাথের ডাকে বিজয়ের সমস্ত স্বপ্নই পরমুহূর্তেই চুরমার হ'য়ে গেল। উমানাথ সেই মাত্র কাছারী-বাড়ী থেকে ফিরছেন, তাঁর অবসন্ন বেদনাময় মুখে, বীরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাতের সমস্ত ইতিহাস যেন স্পষ্ট করে লেখা। বিজয় পাংশু মুখে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উমানাথ একটু ইতস্তত করে বললেন,—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বাবা।

বিজয় তাঁর সঙ্গে একটু এগিয়ে যাবার পর তিনি খানিক চুপ করে

থেকে অনেক কষ্টে যেন বললেন,—তোমার বাবা, নির্মলার বিয়ের জন্যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন,—নির্মলার বিয়েতে তিনি সাহায্য করতে চান কিন্তু যেখানে হোক বিয়ে এ মাসেই দেওয়া চাই।

বিজয় স্থাণুর মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উমানাথ খানিক নীরব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোন মতে জমিদারের শেষ আদেশ জানালেন—আর—আর, তোমার এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া তিনি পছন্দ করেন না।

ন্যায় হোক, অন্যায় হোক বাবার আদেশ চিরকাল নির্বিচারে মেনে নিতেই বিজয় অভ্যস্ত, কিন্তু এবার যেন তার ভেতর কোথায় বিদ্রোহের আভাস জেগেছে মনে হল। মনে হল কি যেন একটা সঙ্কল্প তার মনের ভেতর গড়ে উঠেছে। বাড়ীর আবহাওয়া অত্যন্ত থমথমে। মা সাহস করে বিজয়কে কোন কথা বলতেই পারেন না। বিজয়ের অভিমানের আঘাতটা মাধবীকেই সইতে হয়। বিজয়ের কলকাতা যাবার দিন সকাল বেলা মাধবী কি যেন কথা বলতে দাদার ঘরে এসেছিল, বিজয় তাকে শুনিয়ে দিলে,—বাবা যেতে বলেছেন, বেশ আমি আজই চলে যাচ্ছি। কিন্তু আর যদি গ্রামে না আসি তা হ'লে কিন্তু আশ্চর্য হস্ নি।

মাধবীর চোখ জলে ভরে এল, বললে,—অমন কথা কেন বলছ দাদা? মার মনে কত দুঃখ লাগবে বুঝতে পারছ না?

বিজয় ফোঁস করে উঠল,—আর আমার দুঃখটা বুঝি কিছু নয়। আমি অন্যায় কিছু করতে চাইছি?

আমরা কি তা বলেছি। মাধবী কাতরভাবে বললে,—আমি ত মাকে বলতেই মা রাজি হয়েছেন। কিন্তু বাবার যে একেবারে মত নেই। মাকে তবু আবার একবার বলতে বলেছি।

না আর কাউকে কিছু বলতে হবে না। আমার যা করবার ঠিক করে ফেলেছি'—বেশ রুক্ষ স্বরেই কথাগুলো বলে বিজয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা কাছাকাছি থেকে সমস্ত কথাই শুনেছেন। ঘরে ঢুকে ব্যথিত স্বরে বললেন,—কি করব আমি যে কিছুই ঠিক করতে পারছিনে। উনি যা একবার না বলে দিয়েছেন আর তাকে হ্যাঁ করান যে অসম্ভব।

মাধবী এবার উচ্চস্বরেই বললে,—যাই বল মা, বাবার এটা খুব অন্যায়। বংশমর্যাদাটা কি এতবড় জিনিস যার কাছে মানুষের সবকিছু আশা আনন্দ বলি দেওয়া যায়?

বিজয় অন্তত অত সহজে সব-কিছু বলি দিতে যে প্রস্তুত নয়, খানিক বাদে পরিতোষের সঙ্গে তার আলাপেই তা বোঝা গেল। বাবার আদেশের বিরুদ্ধে সামনা-সামনি বিদ্রোহ করবার সাহস তার না থাকলেও একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে হাল সে ছেড়ে দেয় নি। পরিতোষকে বাইরে এক জায়গায় ডেকে নিয়ে ব্যাকুলভাবে সে বলছে শোনা গেল,—তোমাকে এটা করতেই হবে ভাই। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাদের বাচাঁতে পারে না।

পরিতোষ তখন গভীর ভাবে এই সমস্যার কথাই ভাবছে, কোন উত্তর তার কাছে না পেয়ে বিজয় আবার সকাতরভাবে বললে—দুটো জীবন একেবারে ছারখার হয়ে যায় এই কি তুমি চাও? নির্মলার যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়, আমাদের দুজনের কি হবে তাকি তুমি বুঝতে পারছ না?—আমরা আর কেউ ছেলেমানুষ নই পরিতোষ। আমাদের মনের দাগ জলের দাগ নয়!

কিন্তু আমি ভাবছি এ রকম গোপন ব্যাপারের পরিণামটা কি ঠিক ভাল হবে?—পরিতোষের গলার স্বরে অনিশ্চয়তার গভীর উৎকন্ঠা।

বিজয় ব্যাকুলভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলে,—পরিণাম কিছু খারাপ হতে পারে না। আমি জানি, বাবা আজ যাই বলুন, একদিন সবই ক্ষমা করবেন, মার ত মত এখনই আছে।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে,—এখন শুধু কাজটা হয়ে যাওয়া দরকার। নির্মলার বাবা নিরীহ লোক। আমি

চলে গেলে যাতে কোন পীড়নেও নির্ম্মলার বিয়ে তিনি আর না দিতে পারেন, সেইটে আমি করে যেতে চাই।

বিজয়ের যুক্তি হয়ত নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নয়, তবু পরিতোষ আর একবার বলে দেখলে,—তোমার বাবা যাতে মত দেন, তার আর একবার চেষ্টা করলে হয় না।

না ভাই হয় না—বিজয় দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জানালে,—বরং হিমালয়কে টলান যাবে তবু বাবাকে এখন টলান যাবে না। শুধু তাতে তাঁর জেদ বাড়বে, এবং সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। এখন আমি যা বলছি তাই একমাত্র পথ।

খানিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে আর একবার বিষয়টা যেন নিজের মনে ভেবে নিয়ে পরিতোষ বললে,—বেশ চলো!

একবার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দেবার মত লোক পরিতোষ নয়। নির্ম্মলার বাবা উমানাথের কাছে পরিতোষই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে,—এ ছাড়া আর কোন উপায় ত দেখছি না উমাখুড়ো। আর সত্যি জমিদার মশাই একমাত্র ছেলের ওপর চিরকাল রাগ করে থাকতে পারেন না। একদিন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সব ক্ষমা করবেনই।

নিরীহ উমানাথ কেমন যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলেন। পরিতোষের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তবু তিনি একবার বললেন,—কিন্তু লুকিয়ে বিয়েটা বড় খারাপ কাজ হয় না?

লুকিয়ে শুধু ক'দিনের জন্য! যতদিন না বাবার এই জেদটা কেটে যায়,—এবার বিজয় বুঝিয়ে বললে।

উমানাথ তার দিকে ফিরে বললেন,—তার চেয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করলে হত না। ততদিনে তোমার বাবার মত···

বিজয় জোরের সঙ্গে বললে, অপেক্ষা করবার কোন দরকার নেই, আমি বলছি এতে কোন অন্যায় হবে না, একথাও আমি বলছি যে বাবা ভবিষ্যতে আমায় ক্ষমা করেন ভাল, না করলেও

আমি দুঃখ করব না। যা উচিত মনে করি তার জন্যে সব রকম ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত।

উমানাথ খানিক চুপ করে থেকে পরিতোষকেই উদ্দেশ করে বললেন,—আমি কিছু বুঝতে পারছি না পরিতোষ। ভাল-মন্দ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু তুমি যদি মত দাও···

আমিও যে না বলতে পারছি না উমাখুড়ো। বলে পরিতোষ তার অমত করার আসল কারণ জানাল···তা ছাড়া আমার মতে, আসল মনের বন্ধন যেখানে হয়ে গেছে সেখানে বাইরের অনুষ্ঠান লুকিয়ে না প্রকাশ্যে হল সেটা অবান্তর। জমিদার মশাইয়ের অমতটা তাই আমার কাছে খুব বড় কথা নয়।

তা হলে যা ব্যবস্থা হয়, তুমিই কর।—বললেন উমানাথ।

—ব্যবস্থা আজ রাত্রেই করতে হবে উমাখুড়ো। এখানে গোপনে বিয়ে সেরেই বিজয় কোলকাতায় রওনা হয়ে যাবে।

সেই রাত্রে অতি গোপনে উমানাথের ভাঙ্গা কুঁড়েতে বিজয় ও নির্মলার বিয়ে হয়ে গেল। সাক্ষী রইল এক পরিতোষ। সে বিয়েতে ঘটা নেই, উৎসব নেই, সমস্ত অনুষ্ঠানের ওপর কি যেন একটা আশঙ্কার ছায়া। গোপন বিয়ে সেরেই বিজয়কে ট্রেন ধরবার জন্যে বাড়ী গিয়ে ষ্টেশনের জন্যে রওনা হতে হল। নির্মলার কাছে ভাল করে বিদায় নেবার সময়টুকুও তার মিলল না।

গ্রামের অন্ধকার পথে শশীভূষণের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে যেতে বিজয় বুঝি চলে আসবার আগে ম্লান আলোয় দেখা নির্মলার কাতর মুখখানির কথাই ভাবছিল। নব বর-বধূর এ এক অদ্ভুত বিদায় নেওয়া। কতদিনে আবার দুজনের দেখা হবে কেউ জানে না। কি যে তাদের ভাগ্যে আছে, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কিছুই তারা অনুমান করতে পারে না।

বিজয় আচ্ছন্নের মত ষ্টেশনে পৌঁছল। তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে শশীভূষণ যখন নিজের থার্ডক্লাস

গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন তখন বিজয়ের ভাবগতিক তাঁকেও চিন্তিত করে তুলেছে।

নির্মলার সে রাত্রে ঘুম আর আসে না, আসবার কথাও নয়। একা একা ঘরে বিছানার ওপর বসে সে বুঝি গত কয়দিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির ধারাই ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ মনে হল কে যেন বাইরের দরজায় ধীরে ধীরে আঘাত করছে। নির্মলা উঠে দাঁড়াল।

দরজায় আবার টোকার শব্দ পেয়ে ঘরের লণ্ঠনটির আলো বাড়িয়ে বাইরের উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

আমি নির্মলা, দরজা খোল।

একি! এত বিজয়ের কণ্ঠস্বর। নির্মলা কম্পিত বুকে দরজা খুলে বললে,—তুমি, তুমি চলে যাওনি।

না নির্মলা যেতে পারলাম না! ট্রেন থেকে নেমে চলে এলাম।

ট্রেন থেকে নেমে—নির্মলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

খুব কি অন্যায় করেছি নির্মলা? তুমি কি খুব রাগ করলে?

নির্মলা তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে,—না রাগ করিনি। কিন্তু তুমি আসবে যে তা···

বিজয় ব্যাকুলভাবে তার কথাটা নিজেই পূরণ করে বললে—ভাবতে পার নি কেমন? আমি কাল সকালেই চলে যাব নির্মলা, কেউ কিছু জানবার আগেই চলে যাব। শুধু তোমায় আর একবার না দেখে যেতে পারলাম না। মনে হ'ল কতকাল আর দেখা হবে না কত কথার কিছুই বলা হয় নি···

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বিজয় আবার একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে,—না তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ বুঝতে পারছি, আমি তা হ'লে এখুনি যাচ্ছি।

নির্মলা এবার কাতর হ'য়ে বললে,—না, না, তোমায় যেতে ত আমি বলি নি। আমি বাবা মাকে ডাকি?

তাঁদের ডাকবে? বিজয় যেন একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল।—কিন্তু এখন না ডাকলেও কোন ক্ষতি নেই নির্মলা, কাল সকালে যাবার আগে ডাকলেই হবে।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার হেসে বললে,—হয় ত তুমি ভয় পাচ্ছ নির্মলা। আমাদের বিয়ে যে হয়ে গেছে তাও তুমি ভুলে যাচ্ছ বোধ হয়।

তা ভুলবো কেন? নির্মলা হেসে মাথা নীচু করলে।

তা হ'লে আমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব নির্মলা?—বিজয় হেসে জিজ্ঞেস করলে।

না, না, এস।—বলে নির্মলা আলো দেখিয়ে বিজয়কে ঘরে নিয়ে গেল। বিজয় ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর বসে নির্মলাকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বললে,—ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে? কাছে এসে বসতে নেই বুঝি?

নির্মলা হেসে কাছে এসে দাঁড়াতে বিজয় আবার বললে,—সত্যি এখনো তোমার দূরে থাকতে ইচ্ছে করে?

সলজ্জ হেসে নির্মলা বললে, ইচ্ছা করলেই কি আসা যায়?

বিজয় আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললে,—কেন যায় না নির্মলা। কোন বাধা ত আজ সত্যি নেই। আর কেউ না জানুক আমরা জানি আমাদের বিয়ে হয়েছে। সে বিয়েতে কি তোমার বিশ্বাস নেই?

বিশ্বাস না থাকলে এমন করে এখানে থাকতে পারতাম? আমি সে কথা ভাবছি না—

কি ভাবছ তুমি?—জিজ্ঞাসা করলে বিজয়।

ভাবছি তোমার বাড়ীতে যদি জানতে পারে।

বিজয় হেসে বললে,—কেউ জানতে পারবে না। কাল ভোরের ট্রেনে আমি চলে যাব। সেখানে গিয়ে বলব মাঝখানে একটা স্টেশনে চা খেতে নেমে আর উঠতে পারি নি।

নির্মলাকে হাসতে দেখে বিজয় আবার বললে,—হাসছ

নির্মলা। ভাবছ কত ফন্দিই না করে এসেছি। কিন্তু সত্যি কোন ফন্দি আগে থাকতে করি নি। হঠাৎ ট্রেনে উঠে আর বসতে পারলাম না। মনে হ'লো তোমায় একবার না দেখলে নয়, কোন কথাই তোমার কাছে আমার বলা হয় নি।

বিজয় তার জামাটা খুলে এবার টেবিলের উপর রাখলে। সেটা গুছিয়ে রেখে নির্মলা জিজ্ঞাসা করলে—তুমি বুঝি অনেক দিন কলকাতায় থাকবে?

হ্যাঁ, এখানকার হিসেবে অনেকদিন, হয় ত দু'মাস সেখানে থাকতে হবে। এতদিন অন্ততঃ তোমার হাতের চিঠি না পেলে কিছুতেই থাকতে পারব না। চিঠি দেবে ত?

কিন্তু তোমার ঠিকানা ত জানি না।

বিজয় হেসে বললে,—সেই জন্যেই আবার এলাম নির্মলা। মনে হ'লো ঠিকানাটাও তোমায় বলে আসা হয় নি।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে তার ওপর ঠিকানাটা লিখে বিজয় নিজের ফাউণ্টেন পেনটা শুদ্ধ টেবিলের ওপর রেখে বললে,—এই আমার ঠিকানা লেখা রইল, আমার কলমটাও সঙ্গে সঙ্গে রেখে দিলাম। এই কলমটা দেখলে অন্তত আমায় চিঠি লেখার কথা তোমার মনে পড়বে নির্মলা। আচ্ছা, কালই আমায় একটা চিঠি লিখবে বল, লিখবে? বল অন্তত, একদিন অন্তর তোমার চিঠি আমি পাবই।—বিজয়ের স্বরে অসীম ব্যাকুলতা।

আর তুমি বুঝি লিখবে না!

নিশ্চয় লিখবো, বলে হঠাৎ বিজয় আলোটা নিভিয়ে দিলে।

কেন আলোটা কি দোষ করলে?—হেসে জিজ্ঞাসা করলে নির্মলা।

বিজয়ের হাসি শোনা গেল অন্ধকারে,—দোষ করে নি। বাইরের চাঁদের আলো ওর ভয়ে ঢুকতে পারছে না ঘরে।

বিজয় কোলকাতা রওনা হয়ে যাবার দুদিন পরেই জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ শশীভূষণের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। চিঠির শেষ দিকটা পড়ে তাঁকে বিশেষ চিন্তিত দেখা গেল। সরকারমশাই লিখেছেন—

…কাল সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিজয়

বাবাজীবন অবশ্য নিরাপদেই আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুনিলাম পথে ট্রেন হইতে কোন কারণে নামিয়া আর সময়মত উঠিতে পারে নাই। সেই জন্যে পরের ট্রেনে তাহাকে আসিতে হইয়াছে। ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া আপনার গোচর না করিয়া পারিলাম না। আমার নমস্কার জানিবেন। নিবেদন ইতি ঃ

বংশবদ্

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিজয়ের মা কি কাজে সেই সময়ে ঘরে এসেছিলেন। স্বামীর হাতে চিঠি দেখে তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন,—কার চিঠি গো? বিজয় এর মধ্যে চিঠি দিয়েছে?

না বিজয় নয়, সরকারমশাই। বীরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর মুখে জানালেন!

অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, সরকারমশাই! কেন? বিজয়ের শরীর-টরির···

শরীর তার ভালই আছে। কোন ভয় নেই। তবে আমার আজই কোলকাতায় যেতে হবে।—অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে কথাগুলো বলে জমিদার উঠে পড়লেন।

অন্নপূর্ণার উদ্বেগ তাতেই বেড়ে গেল। বললেন,—তুমি আমায় কি যেন লুকোচ্ছ। সত্যি বল, বিজয়ের কিছু হয়েছে কি?

তোমায় বলবার মত কিছু হয় নি, জেনে রাখো সে ভালোই আছে।—বলে জমিদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কলকাতায় বিজয়ের পড়াশুনার জন্যে একটা আলাদা বাসা ঠিক করা আছে। দেখাশুনা করে শশীভূষণ।

বীরেন্দ্রনারায়ণ পরের দিন সেখানে গিয়ে উঠলেন এবং সকালেই শশীভূষণের সঙ্গে গম্ভীর মুখে বিজয়ের প্রসঙ্গই আলোচনা করতে দেখা গেল।

বীরেন্দ্রনায়ায়ণ গম্ভীর মুখে শশীভূষণকে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় নেমেছিল তুমি কিছু টের পাও নি?

কি ক'রে পাব বলুন, আমি ত ভিন্ন কামরায়! পাহারা

দিতে হবে জানলেও না হয় জেগে থাকতাম ! —শশীভূষণের সেই নিজস্ব অদ্ভুত গলার স্বর ও ভঙ্গি। সসংকোচে কৈফিয়ত দিচ্ছেন, না, মনে মনে হাসছেন, বোঝবার উপায় নেই।

খানিক চুপ করে থেকে বীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—কোলকাতায় পৌঁছেই আমায় তার কর নি কেন ?

আপনাকে মিছিমিছি ব্যতিব্যস্ত করবার ভয়ে। সেখান থেকে ত আপনি কিছুই করতে পারতেন না, শুধু বাড়ীর সবাই ব্যতিব্যস্ত হত। একটু থেমে শশীভূষণ আবার বললে—আমি গ্রামের স্টেশন মাস্টারকে 'তার' করেছিলাম।

এবার জমিদার মশাই সত্যি অবাক হলেন,—গ্রামের স্টেশন মাস্টারকে ?

শশীভূষণ জমিদার মশায়ের বিস্ময়টা একটু উপভোগ করে বললেন,—হ্যাঁ, তাঁর ফিরতি 'তারে'ই জানলাম, বিজয় পরের দিন ভোরের ট্রেনে সেখান থেকে রওনা হয়।

বিজয় রাত্রে গ্রামেই ছিল ! কোথায় ?—বীরেন্দ্রনারায়ণ চেষ্টা করেও গলার স্বর সংযত রাখতে পারলেন না।

শশীভূষণ অসহায় ভাব করে বললেন,—তা কি করে জানব বলুন ?

জমিদার গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন,—হুঁ। তারপর তিনি সে ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করতেই শশীভূষণ হঠাৎ আবার বললেন,—বিজয়ের নামে গ্রাম থেকে একটা চিঠিও এসেছে। চিঠিটা আমাদের বাড়ীর নয়।

বীরেন্দ্রনারায়ণ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর শশীর দিকে অবাক হ'য়ে খানিক চেয়ে থেকে বললেন—চিঠি তাকে দিয়েছ ?

না, এখনও দিই নি।

চিঠিটা দাও,—বলে জমিদার হাত বাড়ালেন এবং শশীর কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন,—চিঠিটা আমার কাছে থাক !

জমিদার মশাই ঘর থেকে চলে যাবার পর শশীভূষণ আপন মনে হেসে নিজের কাজে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে বিজয় হাসিমুখে এসে বললে,—Good Morning শশীকাকা। ও তুমি আবার

গুড্ মর্ণিং টর্ণিং বোঝ না, কিন্তু সুপ্রভাত বোঝ ত? চমৎকার সকাল যাকে বলে! কি চমৎকার সকালটা আজ বল ত?

শশীভূষণ একটু হেসে বললেন,—আমাদের ত আর সকাল নেই, বাবা, সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে।

বিজয় হেসে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা কাকা, আমার চিঠি-পত্র কি এসেছে দাও দেখি?

ক্ষণেকের জন্যে শশীভূষণের মত লোককেও যেন একটু বিব্রত মনে হল। একটু থতমত খেয়ে বললেন,—চিঠি! না, কই চিঠি ত আসেনি।

না, না, নিশ্চয় এসেছে, তুমি দেখ—বিজয় নাছোড়বান্দা।

শশীভূষণ আরো যেন বিব্রত হয়ে বললেন,—দেখব কি বল, চিঠি ত আর অদৃশ্য জিনিষ নয়।

বিজয়ের মুখের হাসি এবার সত্যি মিলিয়ে গেল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নির্মলার চিঠি আসবেই—চিঠি আসে নি, সত্যি চিঠি আসে নি? সে আরেকবার জিজ্ঞাসা করলে, তারপর শশীভূষণকে মাথা নাড়তে দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চৌধুরী মশাই নিজের ঘরে গিয়ে চিঠি খুলে পড়ে প্রথমে স্তম্ভিত; তারপর একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ শশীভূষণকে নীচে থেকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গম্ভীর স্বরে—এ চিঠিতে কি আছে জান?

আজ্ঞে না, আমি ত খুলে পড়ি নি,—শশীভূষণের কণ্ঠস্বরে একটু যেন প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

চৌধুরী মশাইয়ের সেইটুকু লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তখন নয়। রাগে আগুন হয়ে তিনি বললেন,—বিজয় লুকিয়ে পুরুত মশাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করেছে।

শশীভূষণের মুখেও এবার বুঝি বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা গেল। জমিদার মশাইয়ের রাগ চড়েই চলেছে, বললেন,—আমার মতের বিরুদ্ধে সে লুকিয়ে বিয়ে করতে সাহস করল! কিন্তু ও জানে না যে বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিজের ছেলের অপরাধও ক্ষমা করে না।

শশীভূষণ বেশ শান্তকণ্ঠে মন্তব্য করলেন,—হয় ত জানে বোলেই লুকিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে।

জমিদার মশাই তার দিকে বিরক্তভাবে একবার তাকালেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন,—এ বিয়ে আমি মানব না। আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব।

তাতে বিয়েটা ওর কাছে বাতিল হয়ে যাবে না,—আবার মন্তব্য করলেন শশীভূষণ!

জমিদার মশাই আবার আগুন হয়ে উঠলেন,—এই অন্যায় আমি তা বলে সহ্য করব?

ন্যায়-অন্যায় আপনি জানেন; তবে সহ্য না করবার সোজা পথ ছেলেকে ত্যাগ করা নয়,—শশীভূষণের স্বর এবার বেশ গম্ভীর।

চৌধুরী মশাই খানিক চুপ করে থেকে এই কথাটাই যেন ভালো করে ভেবে নিয়ে বললেন,—আমি আবার ওর বিয়ে দেব।

শশীভূষণ হাসলেন,—ও আপনারই ছেলে। জোর ক'রে মোচড় দিতে গেলে ভেঙ্গে যাবে। ওকে সইয়ে সইয়ে ছাড়া নোয়ানো যাবে না।

এবারেও চৌধুরী মশাইকে বেশ খানিকক্ষণ ভাবতে হ'ল। তারপর তিনি বললেন,—বেশ, আজ থেকে পুরুত মশায়ের বাড়ীর কোন চিঠি যেন ওর হাতে না যায়। সমস্ত চিঠি আসবামাত্র তুমি ছিঁড়ে ফেলবে।

আর বিজয় যে চিঠি দেবে,—জিজ্ঞাসা করলেন শশীভূষণ।

বিজয় ত নিজে চিঠি ফেলে না?

তা ফেলে না বটে; আমার হাত দিয়ে ডাকঘরে পাঠায়—বললেন, শশীভূষণ।

চৌধুরী মশায় হুকুম দিলেন,—সে চিঠিও যেন ডাকঘরে না পৌঁছায়। বিজয়ের গ্রামে যাওয়াও আমি বন্ধ করলাম।

শশীভূষণ একটু হেসে বললেন,—শুধু তাতেই কিছু হবে ব'লে মনে হয় না। কুপথ্যি বন্ধ হলেই রোগ সারে না, ওষুধও চাই।

হুঁ, তার ব্যবস্থাও করব।

জমিদার মশাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই যেন ভাগ্যের নির্দেশের মত বাইরে একটা মোটরের হর্ণ বেজে উঠল।

দেখা গেল, একটি বেশ সমৃদ্ধ চেহারার মোটর সেখানে এসে থেমেছে। ভেতরে তিনটি তরুণী ও একজন বর্ষিয়সী মহিলা। দুবার ড্রাইভার হর্ণ দেবার পরও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বর্ষিয়সী মহিলা বললেন,—কই কারুর ত সাড়া নেই। ঠিক এই বাড়ী ত?

সবচেয়ে ছোট মেয়েটি বুঝি একটু বেশী চঞ্চল। সে বলে উঠল —হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা, নম্বর দেখতে পাচ্ছ না।

মা ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বললেন,—যাও না ড্রাইভার, তুমি না হয় নিজে নেমেই চিঠিটা দিয়ে এস না। তাতে তোমার মান যাবে না।

ড্রাইভার নেমে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে ফিরে এসে বললে,—কই কাউকে ত দেখতে পেলাম না।

কেউ কিছু বলবার আগেই ছোট মেয়েটি ড্রাইভারের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল। তারপর—আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, একটা চিঠি দিয়ে আসতে মারামারি ব্যাপার!— বলে দে ছুট।

সমস্বরে মা ও বোনেরা এবার পিছন থেকে চীৎকার করে উঠলেন। —এই বুলা, বুলা! দেখছ কাণ্ড! ছিঃ, ছিঃ, কি হচ্ছে বুলা!

কিন্তু বুলা তখন একেবারে দরজায়, সেখান থেকে ফিরে একবার বললে,—আমি এখুনি দিয়ে আসছি মা।

তারপর ভেতরে সে অন্তর্ধান।

গাড়ীতে মার অবস্থা দেখে বোঝা গেল বুলাই তার জীবনের একটি প্রধান উৎকণ্ঠা ও উপদ্রব। প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়ে হাতপাখা চালাতে চালাতে বললেন,—না, মান-সম্ভ্রম আর রইল না। বুলা আমায় পাগল করে দেবে। বড় মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন,—অনু আমার স্মেলিংসল্ট্।

মেয়েরা মায়ের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বুলা তখন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে তর্-তর্

করে উঠে একেবারে জমিদার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছে। জমিদার মশাই ও শশীভূষণ দুজনেই তাকে দেখে অবাক। সে কিন্তু বেশ সপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—এটা বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী ত' ?···তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই জমিদার মশাইয়ের কাছে এসে নমস্কার করে বললে,—বাঃ আপনিই ত জ্যাঠামশাই !

বীরেন্দ্রনারায়ণ একেবারে হতভম্ব,—আমি ?

হ্যাঁ, আমি দেখেই চিনেছি, বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাম কি যাকে তাকে মানায় ! আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনার···বলেই খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে বুলা বললে—না বলব না।

জমিদার মশাই এই অনর্গল হাসি ও কথার মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে সবিস্ময়ে বললেন,—কিন্তু আমি ত···

কথা আর তাঁকে শেষ করতে হল না। বুলা আবার হেসে উঠে বললে,—আমায় চিনতে পারছেন না বুঝি ? আমি বাবার কাছ থেকে আসছি। ওই যা ! দেখেছেন কি ভুল ! শুধু বাবা বললে আপনি চিনবেন কি করে ? আমার বাবা হলেন রাজীব মুখোপাধ্যায়—

এতক্ষণে জমিদার মশায় একটু আলো দেখতে পেয়ে বললেন,—ও তুমি রাজীবের মেয়ে ?

হ্যাঁ ছোট মেয়ে,—বুলার কথার উৎস আবার খুলে গেল।—আপনি আমায় চিনতে পারেন নি ত ? কি করে চিনবেন ? আমায় কত ছোট দেখেছেন, আর আমি এখন দিদির সমান লম্বা হয়ে উঠেছি। কিন্তু দিদির মত সুন্দর হইনি। মা ত রোজ বলে তাল গাছ ! ওই যা আসল কথাই ভুলে যাচ্ছি। বাবা একটা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে।

চিঠিটা বার করে চৌধুরী মশাইয়ের হাতে দেবার পর তিনি পড়বার উপক্রম করতেই বুলা হেসে বললে,—চিঠি আর পড়বেন কি ? আপনাদের যেতে হবে আমাদের বাড়ী, আজকেই। আপনি আর আপনার ছেলে এখানে থাকেন। বাবার অসুখ কিনা, পেন্সন নিয়ে কোলকাতায় আসা অবধি অসুখ। অসুখের চেয়ে অবশ্য অসুখের বাতিক বেশী। রাতদিন খালি ভাবেন, অসুখ

হয়েছে। আমরা কত হাসি! বলেই বুলা আর এক দফা হেসে নিল, তারপর বললে,—হ্যাঁ যা বলছিলাম। বাবার অসুখ বলে আসতে পারলেন না, কিন্তু বাবা আমাদের পাঠিয়েছেন।

জমিদার মশাই সস্নেহে হেসে বললেন,—বোলো আমি নিশ্চয়ই যাব।

বুলা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল,—সে আমি জানতাম! আপনারা খুব পুরোনো বন্ধু না? বাবার কাছে আপনার কত গল্প শুনেছি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় সে উঠে পড়ে বললে, না, আমি যাই তাড়াতাড়ি! মা, দিদিরা এতক্ষণ বোধ হয় ভেবে সারা হচ্ছেন। ওরা যা ভীতু।

জমিদার মশাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে বললেন, তোমার মা দিদিরা এসেছেন নাকি?

এসেছেন ত! ওই বাইরে মোটরে আছেন। কথাটা বলে ফেলেই জিভ্ কেটে সে বললে,—ওই যা আপনাকে ব'লে ফেললাম, মা শুনলেই রাগ করবেন। ওরা এখন unofficially এসেছেন কিনা! —বুলার আবার হাসি উথলে উঠল। আমি যাই এখন, বলে দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে সে আবার বললে,—তখন কি বলতে যাচ্ছিলাম জানেন? বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি ভেবেছিলাম আপনার আরো মস্ত বড় গোঁফ হবে।

তারপর বুলা আর সেখানে দাঁড়ায়! সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা মিষ্টি উচ্ছ্বসিত হাসি শোনা গেল।

জমিদার মশাই এমন মেয়ে তাঁর জীবনেও দেখেন নি। এ যেন প্রাণের উচ্ছ্বসিত ঝরণাধারা। তিনি স্নেহ-সিক্ত মনে মেয়েটির কথাই ভাবছিলেন। শশীভূষণের কথায় তাঁর যেন চমক ভাঙ্গল।

রাজীববাবুর মেয়েগুলি সুন্দরী বলে মনে হয়! তবে বোধ এয় একটু হাল-ফ্যাসানের!

জমিদার মশাই একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আজ বিজয়কে নিয়ে ওদের বাড়ী যাব ঠিক করলাম। অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু!

আর কোন কথা তারপর হ'ল না। জমিদার মশাইয়ের ঘর থেকে নীচে নামতে নামতে শশীভূষণকে গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে শোনা গেল

আমার দোষ কিছু নাই শঙ্করী
সাধুর সাথে সাধু সাজি চোরের সাথে সড়্‌ করি।

বিজয় ঘরে বসে নির্মলাকে চিঠি লিখছিল। লিখছিল,—

এই সামান্য কথাটুকু তুমি রাখতে পারবে না আমি সত্যই ভাবি নি নির্মলা। আমি সত্যই বিশ্বাস করেছিলাম তোমার চিঠি পাবো। একটুখানি চোখের আড়াল হতেই যদি এমন ভুল হয়, তা হলে আমায় ভুলতে তোমার ত বেশীদিন লাগবে না। তোমার চিঠি না পেয়েও এই চিঠি দিচ্ছি। এর উত্তর দিতে একটুও দেরী ক'রো না কিন্তু···

চিঠি লেখার মাঝেই চৌধুরী মশাইয়ের বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল,—'বিজয়'।

তাড়াতাড়ি চিঠি শেষ করে বিজয় সেটি পকেটে ফেলে উত্তর দিলে,—যাই বাবা।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই জমিদার মশাই গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন,—তুমি তৈরী হয়ে নাও তাড়াতাড়ি। আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।

কোথায় বাবা ?

আমার পুরনো বন্ধু রাজীববাবুর বাড়ী! কোলকাতায় কিছুদিন হলো এসেছেন। তোমার আলাপ করা বিশেষ দরকার।

বিজয় একটু ইতস্তত করে বললে,—কিন্তু আমি···

যাও, তৈরী হয়ে নাও শীগ্‌গির! অসহিষ্ণুভাবে আদেশ দিয়ে চৌধুরী মশাই চলে গেলেন।

বিজয় খানিক নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শশীভূষণের কাছে গিয়ে বললে,—এই চিঠিটা এখুনি ফেলবার ব্যবস্থা করবে শশীকাকা, ভয়ানক জরুরী বুঝেছ!

শশীভূষণকে চিঠিটা দিয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বললে,—বাবার আবার কি খেয়াল, রাজীববাবুর বাড়ী যেতে হবে।

শশীভূষণ উত্তরে একটু হাসলেন মাত্র। সে হাসির অর্থ বিজয় আর কেমন করে বুঝবে।

চৌধুরী মশাইয়ের পুরাতন বন্ধু রাজীববাবু এককালে বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় বাড়ী করে সেইখানেই বাস করছেন। অবস্থা বেশ ভালো, রুচি-মার্জিত ও আধুনিক। তবে স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর সামাজিক উচ্চাশায় মাঝে মাঝে তাঁকে একটু বিব্রত হতে হয়। রাজীববাবু থেকে আরম্ভ করে মেয়েরা সবাই হেমাঙ্গিনীর শাসনে তটস্থ। এক ছোট মেয়ে বুলা যা একটু ব্যতিক্রম। হেমাঙ্গিনীর ভ্রূকুটিও তাকে সব সময় দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সেদিন সকালবেলা বীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ছেলের অভ্যর্থনার জন্যই হেমাঙ্গিনী একটু বেশী ঘটা করে আয়োজন করেছেন। আসবাব পত্র থেকে মেয়েদের সাজ পোষাক সব দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি পড়েছে। বড় মেয়ে অনিমা ড্রয়িং-রুমে ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছিল। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হেমাঙ্গিনী সেখানে ঢুকলেন, মেয়ের পোষাকের দিকে চেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলেন,—অনিমা, তবু তুমি 'হাইকলার'টা পরে আস নি? না তোমাদের নিয়ে আর পারব না! আর ওই শাড়ীটা! না কতবার বলব ও ছাই রঙ তোমায় মানায় না flame colour-টা পর নি কেন?

অনিমা মার কথার ওপর কথা কওয়া বৃথা বুঝেও মৃদু প্রতিবাদ করে,—কিন্তু মা—

হেমাঙ্গিনী একেবারে অধৈর্য হ'য়ে পড়েন,—না, তোমরা আমায় পাগল ক'রে দেবে। একটা সামান্য জামা পর্যন্ত নিজেরা বুঝে পরতে পার না।

এবার পেছন থেকে বুলার হাসি শোনা যায়। সে বলে ওঠে, —আমি বললাম দিদিকে, মা তোমায় একেবারে আগুন না লাগিয়ে ছাড়বেন না। একেবারে ছুঁলেই ভস্ম!

হেমাঙ্গিনী গম্ভীরভাবে ধমক দিয়ে বলেন,—বুলা!

বুলা অতি কষ্টে হাসি চেপে অন্য দিকে মুখ ফেরায়।

হেমাঙ্গিনী অনিমাকে আবার আদেশ দেন,—যাও অনিমা যাও, হাই-কলার ব্লাউজ আর সেই শাড়ীটা পরে এসো। আমায় আর জ্বালাতন করো না।

রাজীববাবু তখন ঘরে ঢুকছেন, একটুখানি মেয়ের পক্ষে ওকালতি করবার চেষ্টা করে বলেন,—কেন মিছামিছি এত ব্যস্ত হচ্ছ বল ত। এ ত আর state reception নয়! আমার পুরনো বন্ধু আসছে তাঁর ছেলেকে নিয়ে···

তুমি চুপ কর দেখি।—হেমাঙ্গিনী ধমকে ওঠেন।—তোমার বন্ধুর তোমার মত রুচি নাও হতে পারে। যাও অনিমা যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না।

বুলার হাসির সঙ্গে টিপ্পনী শোনা যায়,—যাও না দিদি, শেষে মার আবার এখুণি smelling salt-র দরকার হবে।

সত্যি বুলাকে নিয়ে আর পারা যায় না। হেমাঙ্গিনী আবার শাসন করেন,—বুলা!

বুলা একেবারে নেহাৎ ভাল মানুষের মত মার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে,—না মা আমি শুধু বলছিলাম, তোমায় মিছামিছি জ্বালাতন করা কেন? আমি এ জামাটা বদলে আসব মা?

না, তোমায় আর জামা বদলাতে হবে না।—হেমাঙ্গিনী অপ্রসন্ন মুখে অন্য দিকে চলে যান।

বুলা যেন নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলে,—বেশ, বদলাব না। তারপর মেজদিদি লিলির কাছে দুঃখ জানিয়ে বলে,—জানিস মেজদি, মার শুধু দিদি আর দিদি। আমাদের পোষাকের একবার খুঁতও ধরে না!

লিলি নেহাৎ নিরীহ শান্ত মেয়ে। তার মুখে কদাচিৎ একটা কথাও শুনতে পাওয়া সৌভাগ্য। বুলা তাই বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানিয়ে বলে,—খুব অন্যায় বাবা?

রাজীববাবু একটু হেসে আদর করে বলেন,—তোমাদের পালাও আসবে মা, কোন ভাবনা নেই। যতদিন নিরাপদে আছ, দুঃখ ক'রো না।

রাজীববাবু রসিকতাটা গোপনই করবার চেষ্টা করেছিলেন, হেমাঙ্গিনীর কিন্তু কথাটা কানে যায়। তারপর আর রক্ষা আছে।

হেমাঙ্গিনী রুদ্র-মূর্তিতে স্বামীকে শাসন করেন,—ওই করেই ত মেয়েগুলির মাথা খেয়েছ। আমি যা করব তাতেই শুধু ঠাট্টা।

হঠাৎ বাইরের দরজায় 'বেল' বেজে উঠতেই এ যাত্রা রাজীববাবু নিষ্কৃতি পান।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলেন—ওই, ওই এসেছে বোধ হয়। যাও বুলা যাও, অনিমাকে ডাক শীগ্‌গির। দেখ দেখি কি কাণ্ড —হেমাঙ্গিনী সাদর অভ্যর্থনার উপযুক্ত হাসি মুখে টেনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁকে এবার হতাশ হতে হয়। বীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ছেলের বদলে একটি সুবেশ এবং একটু বোকা বোকা ধরণের ছেলে ঘরে ঢুকে বলে, আমি—আমি, am I welcome? মানে আমি কি স্বাগত?

ও, তুমি! হেমাঙ্গিনী মুখের বিরক্তি গোপনের কোন চেষ্টা করেন না।

আগন্তুক ছেলেটি একটু বিব্রতভাবে বললে, I didn't know I was expected, মানে জানতাম না আমি প্রত্যাশিত।

বুলা হেসে উঠে বলে, না মিঃ হালদার, আপনি অপ্রত্যাশিত, দেখছেন না মা কি রকম···

বুলার কথা শেষ হবার আগেই হেমাঙ্গিনী হাঁক দেন,—বুলা—

না, মা, আমি শুধু বলছিলাম মিঃ হালদার হঠাৎ আজ এসে পড়ায় মা কি রকম খুশী হয়েছেন!—বুলা তৎক্ষণাৎ একেবারে নিরীহ ভাল মানুষটি।

মিঃ হালদার অবস্থাটা বুঝতে না পেরে নির্বোধের মত একটু হাসেন।

রাজীববাবু তাঁর ওপর দয়াপরবশ হয়ে বললেন,—বসুন মিঃ হালদার। আজ আমার একজন বন্ধু আসছেন কিনা, সবাই তাই একটু ব্যস্ত।

মিঃ হালদার আশ্বস্ত হয়ে এক জায়গায় বসে বলেন—I see, I hope I shall not be in the wap—মানে, আশা করি আমি পথের বাধা হব না।

হ'লে একটু সরে দাঁড়াবেন তৎক্ষণাৎ,—ফোরন দেয় বুলা।

সকলে হেসে ওঠে, এবং সেই হাসাহাসির মধ্যেই চৌধুরী মশাই বিজয়কে নিয়ে প্রবেশ করেন। রাজীববাবু এগিয়ে যান তাঁদের দিকে।

হেমাঙ্গিনী অস্থির হয়ে উঠে বলেন, দেখ দেখি অনিমা এখনও নামল না।

বুলা বলে ফেলে, দাঁড়াও মা, যা হাই-কলারের ফরমাস করেছ। তাড়াতাড়ি নামতে পারছে না।—তারপর চট করে মার দৃষ্টির অন্তরালে সরে পড়ে।

নেহাৎ অতিথিদের সামনে বলে হেমাঙ্গিনীকে শাসনটা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়।

রাজীববাবু, বীরেন্দ্রনারায়ণ ও বিজয়কে সঙ্গে ক'রে ভেতরে এসে বলেন,—ওঃ কতদিন বাদে দেখা বল ত?

হ্যাঁ, আমি ত তোমার ছোট মেয়েকে দেখে চিনতে পারি নি,—বলে চৌধুরী মশাই চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে দেখেন,—তোমার কি এই দুটি মেয়ে নাকি?

হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জানান,—না বড়টি, বড়টি এখনও আসে নি! নমস্কার।

নমস্কার, ভাল আছেন ত?—বীরেন্দ্রনারায়ণ ও বিজয় দুজনে হাত তুলে নমস্কার করেন।

ভাল আর কই? এইটি বুঝি আপনার ছেলে?—সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন হেমাঙ্গিনী।

হ্যাঁ, এই আমার ছেলে বিজয়, এখানে কলেজে পড়ে।

রাজীববাবু সস্নেহে বলেন, আমি আগে ত জানতাম না, তা হলে আগেই কবে ডেকে আনতাম।

চৌধুরী মশাই বলেন,—এখন থেকেই আসবে। এখানে তুমিই ত ওর অভিভাবক।

খুব ভাল কথা। বিজয় এটা তোমার নিজের বাড়ী মনে করবে এখন থেকে—বলে বীরেন্দ্রনারায়ণের দিকে ফিরে রাজীববাবু বলেন,—চল হে আমরা এদের ছেড়ে একটু নিরিবিলি বসে গল্প করিগে যাই।

চল, বলে বীরেন্দ্রনারায়ণও উঠে পড়েন।

বুলা হঠাৎ হেসে বলে ওঠে,—বাবা, প্রথম দিনেই কেন শুধু অসুখের গল্প ক'রো না। জ্যাঠামশাই আর তা হলে আসবেন না।

বুলা !—হেমাঙ্গিনীর চাপা গলার ভর্ৎসনা শোনা যায়।

রাজীববাবু ও বীরেন্দ্রনারায়ণ কিন্তু বুলার কথায় হেসে উঠে তাকে একটু আদর করে ওপরে চলে যান !

হেমাঙ্গিনী এবার বিজয়ের প্রতি ভালো করে মনযোগ দেন,—এইখানে এতদিন আছ অথচ চেনা-পরিচয় হয় নি, কি আশ্চর্য বল ত ! এসব তোমার আপনজনের মত। এইটি আমার মেজ মেয়ে লিলি, এইটি আমার ছোট মেয়ে বুলা।

বুলা সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয়,—ভাল নাম বিনীতা এবং মার চোখের শাসন যেন দেখতেই পায় নি এমনি ভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ইতিমধ্যে মিঃ হালদারের কাশির শব্দ শোনা যায়।

বুলা সেদিকে ফিরে হেসে উঠে বলে,—মা তুমি মিঃ হালদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ না ! উনি neglected মানে, কি বলে অবহেলিত বোধ করতে পারেন।

বুলাকে শাসন করা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে হেমাঙ্গিনী অপ্রসন্ন স্বরে বলেন,—হ্যাঁ, উনি আমাদের একজন পরিচিত—মিঃ হালদার।

মিঃ হালদারের পক্ষে কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট, উচ্ছ্বসিতভাবে বিজয়ের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বলেন, so glad to meet you, মানে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে অত্যন্ত খুশী।

জানেন বিজয়বাবু, মিঃ হালদার ইংরাজী কথা কিছুতেই বাংলা বলবেন না ঠিক করেছেন। বুলা মিঃ হালদারের পরিচয়টা স্পষ্ট করে দেয় !

মিঃ হালদার এক গাল হেসে বলেন,—হ্যাঁ, আমি কি বলে ওই একটু foreign travel মানে বিদেশ ভ্রমণ করেই বাংলা ভুলে যাওয়াটা একেবারে unpardonable crime মানে, ক্ষমাহীন অপরাধ মনে করি।

হাসাহাসির মধ্যে অনিমা ঘরে ঢোকে। দেখা যায়, মার

কথামত পোষাক সে এখনও বদলায় নি। হেমাঙ্গিনীর কঠোর ভৎর্সনা নেহাৎ বিজয় উপস্থিত বলেই জিভের আগায় এসে আট্‌কে যায়। তিনি যথাসম্ভব নিজেকে সম্বরণ করে অনিমার পরিচয় দেন। তারপর সকলকে বসতে বলে বলেন,—চা-টা আসছে, ততক্ষণ একটু গান-টান হতে পারে, কি বল বিজয়?

বিজয় গোড়া থেকেই এই অপরিচিত আবেষ্টনে একটু আড়ষ্ট; নেহাৎ অসহায়ভাবে জানায়,—আজ্ঞে তাই হোক না।

হেমাঙ্গিনী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন,—তোমায় বিজয় বলছি বলে কিছু মনে করো না যেন। তুমি বলতে গেলে আমাদের ঘরের ছেলের মত।

বিজয় কিছু বলবার আগেই মিঃ হালদার অত্যন্ত ক্ষুন্ন স্বরে বলে ওঠেন,—আমাকে কিন্তু হালদার বলে ডাকা আপনার অন্যায়।

হেমাঙ্গিনী তাকে একেবারে অবজ্ঞা করে বিজয়কে বলেন,—তুমি একটা গান গাও না বিজয়।

না, আমায় অনুরোধ করবেন না—বিজয় সলজ্জভাবে জানায়।

আচ্ছা অনিমাই একটা ধর না।—বলেন হেমাঙ্গিনী।

আজকে নয় মা—অনিমা আপত্তি করে।

কিন্তু সে আপত্তি টেঁকে না! হেমাঙ্গিনী কঠিন স্বরে বলেন,—আজকে নয় মানে? কেন, আজকে কি দোষ হয়েছে?

অনিমা নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে যায়। মিঃ হালদার তার পিছু পিছু যাবার চেষ্টা করতেই হেমাঙ্গিনী ধমক দিয়ে ওঠেন,—আহা তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ, হালদার?

মিঃ হালদার থতমত খেয়ে বলেন,—না এই পিয়ানোটা বাজাতে।

ও নিজে বাজিয়ে গাইতে পারবে, তুমি বোস। হেমাঙ্গিনী ধমক দেন। মিঃ হালদার শুকনো মুখে এসে বুলা ও লিলির মাঝে বসে পড়ে। চায়ের আয়োজন তখন এসে পড়েছে। মিঃ হালদারের প্লেটে বুলা স্তূপাকার করে কেক্ টোস্ট সাজাতে থাকে। মিঃ হালদার আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলে হেসে উঠে বলে,—ওটা consolation মানে সান্ত্বনা।

বিজয় কোলকাতায় গিয়েছে কবে! কিন্তু আজও নির্মলা তার কাছ থেকে একটি চিঠিও পায় নি। প্রতিদিন আকুল আগ্রহে রতন পিওনের ডাক বিলির সময় সে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন হতাশভাবে তাকে ফিরতে হয় ঘরে। বিজয়ের এ ঔদাসীন্যের কোন মানে সে খুঁজে পায় না। কোন অপরাধ ত সে করে নি। তবে বিজয় এরই মধ্যে কি আমাকে ভুলে গেল? না, সে কথা নির্মলা বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের শেষ বিদায়ের আগেকার সেই রাতের কথা তার মনে এখনও যে উজ্বল হয়ে আছে। বিজয়ের সেই আকুলতা, সেই আশ্বাস সে কি শুধু ভাণ? না, নির্মলা তা বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু তাহলে বিজয় এমনভাবে নীরব হয়ে আছে কি করে? আশঙ্কায়, দুর্ভাবনায় নির্মলার দিনরাত্রি দুর্বহ হয়ে ওঠে। ম্লানমুখে প্রতিদিন সে চিঠির আশায় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে যখন ফিরে আসে তখন মনে হয় পৃথিবী বুঝি অন্ধকার হয়ে গেছে।

মা কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—রতন পিওন গেল না এদিক দিয়ে?

নির্মলা কোন জবাব দিতে পারে না।

আজও বিজয়ের কোন চিঠিপত্র এলো না?—মা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করেন।

না,—বলে নির্মলা নিজের ঘরে বিছানায় মুখ গুঁজে উদ্গত অশ্রু দমন করবার চেষ্টা করে।

এদিকে বিজয়ও নির্মলার অদ্ভুত আচরণের কোন কারণ খুঁজে পায় না। দিনের পর দিন এতগুলি চিঠির একটিরও উত্তর সে কি দিতে পারত না! কি তার বাধা? কি তার অসুবিধা? এতগুলি চিঠির একটিও কি সে পায় নি? এমন কথা ত বিশ্বাস করা যায় না। মাসের পর মাস কেটে যায়। বিজয় কি যে করবে কিছুই ভেবে পায় না।

শশীভূষণ সবে বুঝি নির্মলার কাছ থেকে আসা একটি চিঠি ছিঁড়ে ছেঁড়া কাগজের চুবড়িতে ফেলেছেন। বিজয় ক্লান্ত

ম্লানমুখে ঘরে ঢুকে বলে,—আজও কোন চিঠিপত্র নেই বোধ হয় শশীকাকা ?

না, চিঠি ত নেই কোন !—শশীভূষণের কণ্ঠেও যেন কথাটা বেধে যায়।

বিজয় চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বিষণ্ণ স্বরে বলে,—জানো কাকা, আমি ছুটিতে দেশে যেতে চেয়েছিলাম, বাবা বারণ করে চিঠি লিখেছেন ; আমার দেশে যাওয়া কেন বারণ বলতে পার কাকা ?

শশীভূষণ তার মুখের দিকে চাইতে পারেন না, বলেন,—বোধ হয় পড়াশুনার ক্ষতি হবে ভেবে···

কেন, দেশে কি পড়বার জায়গা নেই ?

দেশে ত তুমি নিজেই আগে যেতে চাইতে না বিজয় ?—বলেন শশীভূষণ।

বিজয়ের মনের ক্ষোভ আর চাপা থাকে না। বলে,—কিন্তু এখন যদি দেশে যেতে চাই তবে অন্যায়টা কি হয় ? আমার কি নিজের দেশে যাবার অধিকারও নেই ?

শশীভূষণ একটু চুপ করে থেকে বলেন,—অধিকারের কথা ত হচ্ছে না বিজয়। তোমার বাবা নিশ্চয় তোমার ভালর জন্যেই···আপাতত···

বিজয় এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না। উগ্রস্বরে বলে,—হ্যাঁ, তোমরা সবাই মিলে আমার ভালোই কর শুধু। এত ভালো আর সইতে পারছি না।

শশীভূষণ কি জবাব দেবেন ভেবে পান না।

হঠাৎ দরজায় বুলার তরল মধুর হাসির শব্দ শোনা যায়। অনিমা ও লিলির সঙ্গে ঘরে ঢুকে সে হেসে বলে,—কেমন আমি বলেছিলাম না বিজয়দাকে বাড়ীতেই পাব ! যা কুনো লোক, উনি আবার কোথায় বেরুবেন।

বিজয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে সে বলে,—নিন, তাড়াতাড়ি আসুন দেখি।

সে কি ! কোথায় যাব ?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে বিজয় !

বাঃ ! আমরা যে Picnic-এ যাচ্ছি। আপনাকে অবশ্য আগে

থাকতে জানান হয় নি? কিন্তু সেটা ইচ্ছে করে। জানলে আপনি আগে থাকতে পালাবার সুযোগ পেতেন ত?—বুলা হেসে ওঠে।

অনিমা মৃদু ভর্ৎসনা করে,—আঃ বুলা।

বুলা মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করে দিদির কাছে এসে শাসনের সুরে বলে, দেখো দিদি, মার মত কথায় কথায় খিট্ খিট্ ক'রো না। তোমায় মানায় না।

কিন্তু ওঁর যদি যাবার ইচ্ছে না থাকে!—অনিমা মৃদুস্বরে জানায়।

ইচ্ছে আছে গো আছে। তোমার মতন, প্রাণ চায় চক্ষু না চায় ভাব!—বলে বুলা হেসে ওঠে! অনিমা বুলার মুখের কাছে হার মেনে নিরুপায় হয়ে একটু সরে দাঁড়ায়।

বুলা গম্ভীরমুখে বিজয়ের দিকে ফিরে তাকে দোষ দেয়—দিলেন ত দিদিকে চটিয়ে?

আমি? কেন আমি কি করলাম? বিজয় সঙ্কুচিতভাবে বলে।

বাঃ, আপনি ছাড়া কে? আমরা এতগুলো মেয়ে এসে অনুরোধ করছি তার কোন দাম নেই? জানেন, আর কেউ হ'লে ধন্য মনে করত। জানেন, মিঃ হালদার কখন থেকে সেজেগুজে এসে বসে আছেন। তবু তাঁকে বলতে গেলে নেমন্তই করা হয় নি।

এবার সবাই হেসে ওঠে। বুলা বিজয়কে জোর করে টানতে টানতে বলে নিন্ চলুন আপনার কোন আপত্তি শুনছি না।

নির্মলাদের বাড়ীর দরজায় হঠাৎ সেদিন সাড়া পড়ে গেল। জমিদার বাড়ির জমকালো পাল্কি সেখানে এসে থেমেছে। পাল্কির ভেতর থেকে নেমে আসে জমিদারের মেয়ে মাধবী। নির্মলা বাড়ির দাওয়াতেই প্রতিদিনের মত ম্লানমুখে বসেছিল। হঠাৎ মাধবীকে দেখে অবাক হয়ে উঠে এসে বলে, একি মাধবী!

মাধবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে,—তবু ভাল! তুই চিনতে পারলি!

তাকে সঙ্গে নিয়ে দাওয়ায় আসন পেতে বসিয়ে নির্মলা বলে,—তুই আসবি ভাবতেই পারিনি,—

তাত পারবিই না, কিন্তু না এসে কি করি বল, তুই ত আর যাবি না।

আমি কি করে যাই বল? নির্মলা ম্লানমুখে বলে।

কেন ঘোমটা দিয়ে চৌদলায় চড়ে,—মাধবী পরিহাসের সুরে কথাটা বলেই নির্মলার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে থেমে যায়। তারপর গলার স্বর তার গাঢ় হয়ে আসে বেদনায়, তেমনি করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই ত করেছিলাম, কিন্তু ভাগ্যে হ'ল কই!

নির্মলা নীরবে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

মাধবী আবার বলে,—কেন যে বাবার এত জেদ বুঝি না, দাদা সেই থেকে আর দেশে পর্যন্ত আসে না। মা রাতদিন কাঁদাকাটা করে। বাড়ীতে এমন একটা··

এ-সব কথা থাক মাধবী,—শান্তস্বরে নির্মলা বাধা দেয়।

নির্মলার মুখের দিকে চেয়ে ধরা গলায় মাধবী বলে,—না সত্যি আমারই অন্যায়। এ সব কথা বলতে তোর কাছে আসিনি। শ্বশুরবাড়ী চলে যাচ্ছি কে জানে কতদিনের জন্যে। তার আগে তোর সঙ্গে একবার দেখা না করে যেতে পারলাম না।

মাধবী নির্মলার মুখটি ধরে নিজের দিকে সাদরে ফেরাতে ফেরাতে হঠাৎ চমকে উঠে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে! নির্মলা শক্ত হয়ে বসে থাকে কাঠের মত।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাধবী ধরা গলায় বলে,—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না নির্মলা?

নির্মলার চোখ দিয়ে এবার নিঃশব্দে জলের ধারা নেমে আসে, কিন্তু তবু কণ্ঠস্বর তার শান্ত। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে! সব কথা শুনে যাও। তারপর যা বিবেচনা হয় কোরো।

ইতিমধ্যে মা সেখানে এসে পড়েন। মাধবী তাঁর পায়ের ধুলো নেবার পর তিনি হেসে বলেন,—তখন থেকে দুজনে চুপ করে বসে আছিস। তোদের কি ঝগড়া-ঝাঁটি হ'ল নাকি?

মাধবী জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বলে হ্যাঁ মাসিমা, ভয়ানক ঝগড়াঝাটি! একবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।

আপনি এখান থেকে যান দেখি। আমরা চুপচাপ ঝগড়াটা শেষ করে নিই।

মা একটু স্নেহের হাসি হেসে সেখান থেকে সরে যান।

নির্মলা একে একে সমস্ত ঘটনাই মাধবীর কাছে খুলে বলে। একটিমাত্র দরদীর কাছে এমন করে প্রাণের কথা খুলে বলতে পাওয়া যেন তার কাছে একটা সৌভাগ্য। মাধবী সমস্ত শুনে অনেকক্ষণ গুম হয়ে চুপ করে থাকে। তারপর কাতর স্বরে বলে, আমি ত সবই বুঝলাম। কাল শ্বশুর বাড়ী চলে যাচ্ছি, সেখানে বা এখানে ঘুণাক্ষরেও কেউ আমার কাছ থেকে একথা জানতে পারবে না। তবু গাঁয়ে বেশীদিন কি এ কথা লুকিয়ে রাখা চলবে? কেউ কি এখনও কিছু সন্দেহ করে নি?

হয় ত করেছে!—উদাসভাবে বলে নির্মলা।

সব বুঝেও কিছুই ক্ষমতা নেই,—এই আমার সবচেয়ে দুঃখ। না আমি যাই,—বলে চোখের জল মুছে হঠাৎ মাধবী উঠে চলে যায়।

নির্মলা তাকে পাল্কী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যেতেও যেন পায়ের জোর পায় না। স্থানুর মত সেইখানেই উদাসভাবে বসে থাকে।

গ্রামের লোকের সন্দেহ করার কথাটা নেহাৎ অমূলক কল্পনা নয়। পুকুরঘাটে পাড়ার মেয়েদের ঘোঁট ইতিমধ্যে পাকাতে শুরু করেছে দেখা যায়। স্নান করতে করতে একটি মেয়েকে সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ করতে শোনা যায়।

হ্যাঁ লো হ্যাঁ, আমরা ত আর ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না। তুই-ই বল না, এই ক'মাস তাকে পুকুরঘাটে দেখেছিস কোনদিন?

যাকে প্রশ্নটা করা হয়, সে বিস্ময়ের ভাণ করে বলে,—তা দেখিনি বটে, কিন্তু তলে তলে এত কাণ্ড তা কি করে জানব বল?

এক গাদা বাসন নিয়ে এসে ঘাটের উপর সশব্দে নামিয়ে নতুন আগন্তুক একটি বর্ষিয়সী মহিলা বলেন,—তলে তলে কি কাণ্ড লা মালতী?

না, না, ও কিছু না লক্ষ্মীদি! বলে মালতী।

মালতীর সখি প্রতিবাদ করে,—আহা বলই না লক্ষ্মীদিকে। বলতে ভয়টা কিসের? আমরা ত কারুর চালায় ঘর বেঁধে থাকি না।

তারপর সে বেশ রসাল স্বরে বলে,—ব্যাপারটা আর কি বলব লক্ষ্মীদি। খবর ত আর কিছু রাখ না। তোমাদের পাড়ায় অমন একটা বিয়ে হয়ে গেল।

কার আবার বিয়ে হলো পাড়ায়?—চতুর্থ মহিলার এবার আবির্ভাব হয়।

মালতী এবার নিজেই সোৎসাহে জানায়,—হয়েছে গো রামের মা, হয়েছে, অত ধুমধাম যজ্ঞি কিছু টের পেলে না। তোমরা তা হলে কানে তুলো দিয়েছিলে বোধ হয়।

বর্ষিয়সী মহিলা এবার সবিস্ময়ে বলেন,—লক্ষ্মীর যেমন কথা! আমরা কানে তুলো দিয়ে থাকি! বলে পাড়ার কেউ কুটোটি নাড়লে আমরা টের পাই। একটা বিয়ে এমনি হয়ে গেলেই হল?

মালতী বলে,—বিয়ে না হলে কখনো মাথায় সিঁদুর দেয় শুনেছ?

এবার পর পর মন্তব্য হয়—

ওমা সে আবার কি কথা!

সেই ত কথা!

বলিস কি লা, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না।

ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি জোটে না মা।

বর্ষিয়সী মহিলা এবার আসল কথা পাড়েন,—তা কাক পক্ষী টের পেল না? বিয়েটা হলো কার সঙ্গে? বর কি হাওয়ায় এল হাওয়ায় গেল নাকি?

একজন প্রস্তাব করে, চল না সেটা জিজ্ঞেস করেই আসি। খুব রগড় হবে কিন্তু।

এ প্রস্তাবে সকলেরই সায় আছে দেখা যায়।

মানুষের মধ্যে কোথায় বুঝি নিষ্ঠুরতার চিরন্তন বীজ আছে। দুর্বল অসহায়কে উৎপীড়ন করায় তার অহেতুক আনন্দ! পাড়ার মেয়েরা পুকুরঘাট থেকে সদলবলে সত্যিই নির্মলাদের

বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। একজন ডাক দেন,—কোথায় গো নির্মলার মা! নির্মলার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এতগুলি প্রতিবেশীনীকে একত্র দেখে কি যেন অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন। মেয়েদের একজন ব্যঙ্গ করে বলে,—অনেকদিন দেখা-শোনা নেই একবার দেখতে এলাম গো, সব ভাল ত?

নির্মলার মা সঙ্কুচিতভাবে বলেন,—হ্যাঁ সব ভাল!

কই নির্মলা গেল কোথায়? কতদিন তাকে দেখিনি।

মা আরো সঙ্কুচিত হয়ে উঠে কাতরভাবে বলেন,—তার শরীরটা খুব খারাপ কিনা।

ও শরীর খারাপ বুঝি! তাই বলি নির্মলাকে পাড়ায় দেখতে পাই না কেন?—নিষ্ঠুরভাবে একজন পরিহাস করে।

আর একজন তারি সঙ্গে ফোড়ন দিয়ে বলে,—কতদিন শরীর খারাপ গা?—সবাই হেসে ওঠে।

মালতী বুঝি সবার অগ্রণী। সে বলে, শরীর খারাপ বলেই ত দেখতে আসা। কি বল গো?

তা ছাড়া আর কি? আর শরীর খারাপের ওষুধ পত্তরও তা আছে।

মার চোখ এবার বেদনায় অপমানে অশ্রু-সজল হয়ে আসে—কাতরভাবে মিনতি করে বলেন, আমরা তোমাদের কাছে কোন অপরাধ ত করিনি, কেন তোমরা আমাদের নিয়ে তামাসা করতে এসেছ।

সকলে যেন আকাশ থেকে পড়ে বলে,—তামাসা, ওমা! আমরা তামাসা আবার কোথায় করলাম! নির্মলাকে অনেকদিন দেখিনি তাই···

নির্মলা অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর থেকে এদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নীরবে শুনছিল, এবার আর সে বসে থাকতে পারে না। ধীর অবিচলিতভাবে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বলে, এই আমি এসেছি।

প্রথমটা সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে তার দৃপ্ত কঠিন ভঙ্গীতে একটু বুঝি বিব্রতবোধ করে। তারপর সে অস্বস্তি সামলে উঠতে

দেরী হয় না। একজন বলে,—নাও দেখা হ'ল ত? তোমরা নিশ্চয়ই ভেবে সারা হচ্ছিলে।

মালতী তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, —সত্যি ভাই নির্মলা, অনেকদিন তোকে না দেখে এমন ভাবনা হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ নির্মলার মাথাটা ধরে সকলের দিকে ঘুরিয়ে সে পরম উল্লাসে বলে,—দেখ গো যা বলেছিলাম ঠিক কিনা?

ওমা, তাই ত সত্যিই!

সিঁথিতে সিঁদুর যে!

কবে বিয়ে হ'লো গো নির্মলার মা?

পাড়া-পড়শী আমরা, আমাদের একটা খবর দিলে না?

নির্মলা ঠিক প্রস্তর মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে থাকে। মার চোখ জলে ভরে ওঠে, কিন্তু তার চোখে শুধু যেন আগুন।

আগন্তুকেরা এবার আর দাঁড়াতে যেন ভয় পায়। চলে যেতে যেতে একজন শুধু টিপ্পনি করে বলে,—চলো গো চলো, বিয়েতে না করুক, নির্মলার মা নাতির ভাতে নেমন্তন্ন করবে'খন।

সবাই চলে যাবার পর মা-ই প্রথম একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—এ যে আর সহ্য হয় না মা, কি জন্য এত লাঞ্ছনা তোকে সইতে হবে?

নির্মলা মার দিকে ফিরে তাকায়, জীবনের অসীম অতল হতাসা এর চেয়ে গভীরভাবে মানুষের দৃষ্টিতে বুঝি ফুটে উঠতে পারে না। অত্যন্ত অস্ফুট গলায় সে বলে,—এর চেয়ে আরো লাঞ্ছনা যে বাকি আছে মা,—তারপর আর দাঁড়াতে না পেরে দাওয়ার ধারে বসে পড়ে।

মা নির্মলার গলার স্বরে হঠাৎ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ব্যাকুলভাবে তার কাছে গিয়ে ব'সে, তাকে দু'হাতে জড়িয়ে সভয়ে প্রশ্ন করেন,—আরো?

এতক্ষণ বাদে নির্মলার সমস্ত আত্মসম্বরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মায়ের কোলের উপর মুখ গুঁজে পড়ে সে কেঁদে ফেলে,—হ্যাঁ মা আরো। এখনও কেউ কিছুই জানে না মা, তোমাকেও সাহস করে বলিনি···

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কথা আর শেষ করতে পারে না। মার মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদের মত শুধু বার হয়,—নির্মলা।

যে সম্ভাবনার কথা তাঁর কল্পনাতেও স্থান পায় নি তারই আকস্মিক নিদারুণ উপলব্ধিতে তিনি একেবারে বিমূঢ় হয়ে যান।

মাঁর কোল থেকে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলে নির্মলা শুধু একবার আহত পাখীর মত কাতরভাবে মার দিকে তাকিয়ে আবার মার কোলে লুটিয়ে পড়ে। স্তব্ধ স্তম্ভিত পাথরের মূর্তির মত মা ও মেয়ে অনেকক্ষণ সেইখানেই নিঃশব্দে বসে থাকে। পরস্পরকে কোন কিছু বলবার ভাষা আর তাঁদের নেই।

কিন্তু এমন সর্বনাশের মুখে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও সম্ভব নয়। নির্মলার মা পরের দিন সকালেই উমানাথকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলেন,—না তোমাকে যেতেই হবে। বুঝতে পারছ না কি সর্বনাশ তা হ'লে হবে। আর কি আমাদের লজ্জা সঙ্কোচের সময় আছে। আমাদের মান-সম্ভ্রম, মেয়েটার জীবন পর্যন্ত যে যেতে বসেছে।

নিরীহ ভালমানুষ উমানাথ এই বিপদে আরো যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েন। আচ্ছন্নের মত তিনি বলেন,—আমি যাচ্ছি। কিন্তু জমিদারকে ত তুমি চেন না। একবার তাঁর কথা রাখিনি। তিনি যে আর কোন অনুনয় বিনয়ে গলবেন, তা'ত মনে হয় না।

নির্মলার মা কাতরভাবে বলেন,—কেন তিনি কি মানুষ নন, তাঁর হৃদয় কি পাষাণ? তাঁর নিজের রক্ত যেখানে বইছে সেখানেও কি তাঁর একটু মমতা হবে না! একটা নিরীহ নিরপরাধ মেয়েকে এত বড় কলঙ্কের মধ্যে তিনি ঠেলে দেবেন! এমন করে আমাদের সর্বনাশ করে তাঁর কি লাভ হবে।

উমানাথের আশঙ্কাই কিন্তু সত্য, চৌধুরীমশাই তাঁকে রীতিমত অপমান করেই বললেন,—আজ আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন পুরুত মশাই? আপনার মেয়েকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে? তার জন্য আমার কি দায় বলতে পারেন? একদিন আপনার মেয়ের বিয়েতে আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। সে

সাহায্য আপনি নেন্ নি। ব্যস আমাদের সকল সম্পর্ক চুকে গেছে।

উমানাথ কাতরভাবে বলতে যান,—কিন্তু সে ত আপনারই পুত্রবধূ।

জমিদার মশাই তাঁকে সরোষে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে বলেন,—আমার পুত্রবধূ! বিয়ের সময় আমাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে দিয়েছিলেন বোধ হয়?

উমানাথ তবু মিনতি করেন আপনাকে সবই ত বল্লাম। তখন নিরুপায় হয়ে যে কাজ করেছি তার জন্য আমায় যে শাস্তি দিতে হয় দিন কিন্তু এই একটা নির্দোষ মেয়ের এমন সর্বনাশ হতে দেবেন না।

নির্দোষ হলে তার সর্বনাশ হবে কেন?—জমিদারের কণ্ঠে কঠিন ঔদাসীন্য।

কেন হবে, তা আপনাকে আর কি বোঝাব? আপনি যদি তাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার না করেন, তা হ'লে যে কলঙ্ক তার নামে গ্রামে রটবে তা কি আপনি বোঝেন না?

উমানাথের কাতর আবেদনে কিন্তু কোন ফলই হয় না। চৌধুরী মশাই নিষ্ঠুরভাবে বলেন,—বুঝি আমি সব পুরুত মশাই। কিন্তু আপনার মেয়ে কার সঙ্গে ভ্রষ্টা হয়ে নিজের সর্বনাশ বাধিয়েছে বলে আমি তাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নেব এ-কথা ভাববার স্পর্ধা আপনার কি করে হ'ল?

বজ্রাহতের মত নিস্তব্ধ উমানাথের মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোন কথাই বার হয় না, তারপর তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, এ আপনি কি বলছেন? আপনি তা হলে কোন কথাই বিশ্বাস করেন না? বিজয়ের সঙ্গে নির্মলার যে সত্যি বিয়ে হয়েছে তাও কি আপনি অবিশ্বাস করেন?

নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করি।—চৌধুরী মশাই বজ্রগম্ভীর স্বরে জানান,—আমার অজান্তে এই গ্রামের মধ্যে আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এই কথা আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলেন? আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি পুরুত মশাই, আপনার মেয়ের কলঙ্কের সঙ্গে আমার ছেলের নাম আপনি জড়াতে

চেষ্টা করবেন না। তা হলে গ্রামে বাস করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

উমানাথ কি যেন বলবার চেষ্টা করেন। দুবার তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ ছাড়া আর কোন কথা কিন্তু বার হয় না। হতাশ ভাবে চৌধুরী মশাই-এর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে আচ্ছন্নের মত তিনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান।

মেয়েদের মুখ থেকে পুরুষদের ভেতর কথাটা রটতে তখন আর বাকি নেই। উমানাথের বাড়ীতে ঢোকবার পথে তখন গ্রামের মাতব্বরদের জটলা শুরু হ'য়ে গেছে। বেণীখুড়ো গণেশ ইত্যাদি মিলে একপ্রস্থ আলোচনা শেষ করবার পর আচার্যিমশাই এসে যোগ দিয়েছেন।

বেণীখুড়ো আচার্যিমশাইকে সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করেন,—শুনেছেন ত আচার্যিমশাই, শুনেছেন ত সব?

আচার্যিমশাই পরম বিজ্ঞের মত সর্বজ্ঞতার বাহাদুরী দেখিয়ে বলেন—শুনব আবার কি হে? আমায় শুনতে হয় না, রাম না হতে রামায়ণ আমি আগেই অনুমান করতে পারি।

ভেবেছিল সিঁথিতে সিঁদুর দিলেই আমাদের চোখে ধুলো দেবে।—বেণীখুড়ো হেসে ওঠেন।

গণেশ উপমা প্রয়োগ করে,—হ্যাঁ তেল দাও, সিঁদুর দাও ভবি ভোলবার নয়।

কিন্তু আমরা থাকতে গ্রামে এমন অনাচার কিছুতেই হতে দেব না, এর একটা বিহিত করা চাই—আচার্যিমশাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই দেখা যায় উমানাথ সেই দিকে আসছেন। চুপ চুপ, পুরুত মশাই আসছেন,—বলে সবাই আসন্ন উপাদেয় ঘটনাটির জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়।

উমানাথ আচ্ছন্নের মতই পথ দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ আচার্যিমশাইয়ের ডাকে তিনি চমকে ফিরে তাকান। আচার্যি-মশাই হেসে বলেন,—বলি ব্যস্ততা কিসের? আমাদের প্রতি যে দৃষ্টিপাতই করছেন না।

উমানাথ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—আমায় কিছু বলছেন?

সকলে এবার তাঁকে ঘিরে ধরে। আচার্যিমশাই বলেন,—হ্যাঁ বলছি, এত ব্যস্ত কেন? বাড়ীতে জামাই আসবে নাকি?

জামাই?—উমানাথ বিমূঢ়ভাবে তাঁদের দিকে তাকান।

বেণীখুড়ো নির্মম বিদ্রূপের সুরে বলেন,—হ্যাঁ জামাই! মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, জামাই বোঝেন না?

আচার্যিমশাই ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন,—কন্যার বিবাহ আজকাল আর জামাইয়ের দরকার হয় না হে, কি বলেন পুরুত মশাই! সিঁথিতে সিঁদুর দিলেই সব শুদ্ধ।

এ সব কথার উত্তর দেবার মত মনের অবস্থা তখন উমানাথের নয়। করুণ অসহায়ভাবে তাদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি নীরবে চলে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁকে সেটুকু অনুগ্রহ করতেও প্রস্তুত নয়।

আচার্যিমশাই তাঁর পথ আটকে সরোষে বলেন,—কিন্তু যা ভেবেছেন পুরুত মশাই, তা হবে না। গ্রামের বুকের ওপর যা খুশী অনাচার আপনি করবেন, আর আমরা তাই চোখ বুঁজে সহ্য করব, তা ভাববেন না? কার সঙ্গে কোথায় আপনার কন্যার বিবাহ হয়েছে আমরা সমস্ত জানতে চাই।

গণেশ উপমা প্রয়োগের এ সুযোগ অবহেলা করে না, বলে—নিশ্চয়ই চাই, বিয়ে বল্লেই বিয়ে হল কিনা? বেল পাকলে কাকের কি?

আঃ, তুমি কি যে বক গণেশ!—আচার্যিমশাইকে ধমক দিতে হয়। তারপর উমানাথকে তিনি বলেন—শুনুন পুরুত মশাই, এই গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর এখানে উপস্থিত, আপনার কন্যার বিবাহের রহস্য, এইখানেই আমরা শুনতে চাই। কি বলেন আপনারা?

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই!—সকলেরই এ বিষয়ে সায় আছে দেখা যায়।

উমানাথ কাতরভাবে মিনতি করেন—আপনারা মাপ করুন আমাকে, কোন কথা বলবার মত মনের অবস্থা এখন আমার নয়। দোহাই আমায় ছেড়ে দিন।

এ কাতর মিনতিতে বুঝি পাষাণও গলে যায়। কিন্তু

সমাজের যারা রক্ষক তাঁদের অত কোমল হলে কি চলে। গণেশলাল তাদের সকলের হয়ে রুখে উঠে বলে—ছেড়ে দেব মানে, আপনার মেয়ে গ্রামের সকলের মুখ পুড়িয়ে দিয়ে যাবে, আর আমরা চুপ করে থাকব ভেবেছেন।

একটি লোক কিছুক্ষণ আগে থেকে এই ভীড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শুনছিল। চেহারা দেখলে তাকে ভবঘুরে বলে মনে হয়। মুখে একমুখ দাড়ি। পরণে নোংরা ছেঁড়া পোষাক। লোকটি এইবার ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলে,—চুপ করে' ত থাকবে না, কিন্তু কি করবে বলতে পার ?

খানিকক্ষণ সবাই তার দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে থাকে। তারপর আচার্যিমশাই প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে বলেন,—আরে আমাদের পরিতোষ যে, কত কাল তোমায় দেখিনি, কোথায় গিয়েছিলে বলত ?

পরিতোষ কঠিন স্বরে বলে,—গিয়েছিলুম জেলে এবার আপনাদের সকলের মাথাগুলো ফাটিয়ে আর একবার ফাঁসি যাবার ইচ্ছে আছে।

নিজের অজান্তেই সকলে কেমন সংকুচিত হয়ে সরে দাঁড়ায়।

পরিতোষ উমানাথের হাত ধরে বলে,—চলো উমাখুড়ো। এই ছুঁচোগুলোর গন্ধে এখানে টেঁকা যাচ্ছে না।

শিকার একেবারে হাতছাড়া হয় দেখে আচার্যিমশাই শেষ চেষ্টা করে বলেন—তুমি সব কথা এখনও জান না পরিতোষ !

পরিতোষ ফিরে দাঁড়িয়ে বজ্র কঠিন স্বরে বলে, সব কথা জানলে হয়ত নিজেকে সামলাতে পারবো না আচার্যিমশাই। তার চেয়ে ভালয় ভালয় সব সরে পড়ুন।

সবাই সভয়ে পিছিয়ে যায় এবং পরিতোষ উমানাথকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে যাবার পর আচার্যিমশাই রুদ্ধকণ্ঠে বলেন,—ওই আকাঠ গোঁয়ারটাই সব নষ্টের মূল।

গণেশের এবার আস্ফালন শুরু হয়,—আপনারা সবাই আমায় ধরে ফেল্লেন, নইলে দিচ্ছিলাম আমি একটি রদ্দায় ঠাণ্ডা করে। একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখিয়ে ছেড়ে দিতাম।

আচার্যিমশাই এবার কিন্তু চটে যান,—তুমি থামো গণেশ! কে আবার তোমায় ধরলে?

গণেশলাল কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলে,—ওই মানে—ধরতে যাচ্ছিলেন ত!

নির্মলাদের বাড়ীতে বসে পরিতোষ একে একে সব কথাই শোনে। বহুদিন দেশের কাজে সে গ্রাম ছাড়া। এত ব্যাপার যে সেখানে হয়ে গেছে তার কোন খোঁজই সে রাখে না। সমস্ত ব্যাপার শুনে সত্যি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সে বলে,—এ যে আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না মাসিমা। জমিদার মশাইয়ের এ ব্যবহারের মানে আমি বুঝি, কিন্তু—কিন্তু বিজয় ত সে রকম ছেলে নয়।—নির্মলার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞাসা করে,—একটা চিঠিরও উত্তর সে দেয় নি?

নির্মলার কাছ থেকে কোন জবাবই আসে না। বহুক্ষণ আগে থেকে কঠিন মুখে নিস্তব্ধ হয়ে সে দূরের একটি চালার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের মাতব্বরদের কাছে তার কলঙ্কের কথা নিয়ে বাবার লাঞ্ছনা, সবই বোধ হয় সে শুনেছে। কিন্তু তার মুখে বেদনার কোন ছাপ যেন আর নেই। কোন ভয়ঙ্কর সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় সে মুখ প্রচণ্ড ঝড়ের আগের আকাশের মত গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর।

নির্মলার হয়ে তার মা-ই জবাব দেন,—না বাবা, গিয়ে অবধি কোন চিঠি সে দেয় নি। ছুটিতে দেশেও আসে নি।

আশ্চর্য! আমি এর মানেও বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সব বোধ হয় আমার দোষ,—পরিতোষ অত্যন্ত অনুতপ্তভাবে বলে।

উমানাথ ব্যথিত স্বরে বলেন,—তোমার কি দোষ বাবা, আমরা সরল বিশ্বাসেই এ কাজ করেছিলাম।

কিন্তু আমি এতদিন বাইরে না থাকলে এত সব কিছুই ঘটতে পারত না। পরিতোষের স্বরে গভীর অনুশোচনা ফুটে ওঠে। তোমাদের এমন সর্বনাশ হচ্ছে জানলে দেশোদ্ধারের জন্যেও আমি জেলে যেতে পারতাম না।

উমানাথ অসহায়ভাবে বলেন,—সবই অদৃষ্ট।

পরিতোষ কিন্তু এবার উষ্ণ হয়ে ওঠে,—অদৃষ্ট বলে হাল ছাড়তে আমি রাজী নই উমাখুড়ো! আমি আজ রাত্রেই কোলকাতায় যাচ্ছি। সেখানে বিজয়কে আমি সামনা-সামনি সব জিজ্ঞাসা করতে চাই।

পরিতোষ সেখান থেকে উঠে এসে চলে যেতে যেতে একবার নির্মলার কাছে দাঁড়ায়, কিন্তু বলবার কোন কথা খুঁজে না পেয়েই বোধ হয় নীরবে আবার চলে যায়।

বাড়ীর বাইরে চলে আসবার পর হঠাৎ পিছন থেকে সে নির্মলার ডাক শুনতে পায়,—পরিতোষদা!

পরিতোষ দাঁড়িয়ে পড়ে নির্মলা কাছে এসে দৃঢ় স্বরে বলে,—তোমায় কোলকাতায় যেতে হবে না।

কেন রে? হল কি—পরিতোষ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে।

না পরিতোষদা, আমার জন্যে আর তোমাদের কোন দুঃখ পেতে হবে না।—নির্মলার স্বর কঠিন।

আচ্ছা, আচ্ছা সে সব আমি বুঝব'খন।—পরিতোষ সুরটা হালকা করবার চেষ্টা করে।

নির্মলা কিন্তু তীব্রস্বরে বলে,—আমি বলছি তোমার কোথাও যাবার দরকার হবে না—সব সমস্যার মীমাংসা আমি নিজেই করব।

শেষ কথাগুলো বলবার সময় কিন্তু কোথা থেকে অশ্রুর বন্যা এসে তার সমস্ত অটলতা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করবার চেষ্টায় সে সেখান থেকে চলে যায়। পরিতোষ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকার রাত। স্টেশনে যাবার পথে নির্মলাদের বাড়ী একবার হয়ে যাবার জন্যে পরিতোষ সেই দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ পাশের পুকুরের জলে কি একটা শব্দ পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক, তবু প্রথমটা তেমন কিছু সন্দেহ তার হয় নি। কিন্তু হঠাৎ সকালবেলার সমস্ত কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠে পুকুরের ধারে ছুটে গেল। অন্ধকারে

বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। তবু অস্পষ্ট একটি নারীমূর্তি মনে হল যেন গভীর জলের দিকে নেমে যাচ্ছে। পরিতোষ সশঙ্ক ব্যাকুল স্বরে ডাকলে,—নির্মলা!

নারীমূর্তি যেন চমকে ফিরে তাকাল। এবার একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে পরিতোষ ব্যাকুল ভাবে আবার ডাকলে,—কি হচ্ছে নির্মলা, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন?

নারীমূর্তি তবু নড়ে না দেখে সে নিজেই জলে খানিকটা নেমে গিয়ে বললে—উঠে এস নির্মলা! শোন, শোন, কি করছ তুমি পাগলের মত?

ধীরে ধীরে নির্মলা এবার তার দিকে এগিয়ে এল। তারপর হাতের ঘড়াটা পাড়ের ধারে রেখে প্রায় হিংস্রভাবে বললে—পাগলের মতই যদি করি!—মানুষের কি কখনও পাগল হবার অধিকারও নেই? কেন তুমি বাধা দিলে? আমায় মরেও কি তোমরা শান্তি পেতে দেবে না?

পরিতোষ নির্মলার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বরে বললে,—আমি বাধা নিই নি নির্মলা, তোমার নিয়তিই বাধা দিয়েছে। নইলে ঠিক এমনি সময় স্টেশনে যাবার পথে তোমাদের বাড়ী আসার কথা আমার মনে হত না—তোমায় আমি দেখতেও পেতাম না। কিন্তু ছি ছি তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন নির্মলা?

কেন যাচ্ছিলাম? নির্মলার স্বরে এখনও তিক্ততা। আমি মরলেই সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে বলে। বাবা-মার লাঞ্ছনা, তোমাদের দুর্ভাবনা সব শেষ হয়ে যাবে।

পরিতোষ শান্তস্বরে বললে,—কিন্তু এখনও এত হতাশ হবার ত কিছু হয় নি নির্মলা। আমি ত কোলকাতায় বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি আগে ফিরে আসি—

নির্মলা পরিতোষকে বাধা দিয়ে বললে,—কিন্তু আর যে আমার একদিনও এ গ্লানি সহ্য করবার ক্ষমতা নেই পরিতোষদা। আমার জন্যেই বাবা-মার এই লাঞ্ছনা। কাল সকালেও যে তাঁদের কাছে মুখ দেখাতে আমি পারব না, কিছুতেই পারব না। আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

নির্মলার গলার স্বরে এবার অসহায় হতাশা। পরিতোষও সে স্বরে কাতর হয়ে বললে,—না, না নির্মলা এমন অবুঝ হয়ো না, অকারণ নিন্দা গ্লানি মানুষের জীবনে আসে···

না পরিতোষদা,—নির্মলা ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল,—ও সব কথা আমি জানি, কিন্তু তবু আর সইতে পারছি না। তার চেয়ে তুমি আমায় তোমার সঙ্গে কোলকাতায় নিয়ে চল। আমি তাঁর সামনে গিয়েই একবার দাঁড়াতে চাই।

তা কি করে হয় নির্মলা!—পরিতোষ ব্যথিত স্বরে বললে।

কেন হয় না পরিতোষদা? এখানে আমায় মরতে দিতে যদি না চাও—তা হ'লে একবার শেষ সুযোগ দাও তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবার।—নির্মলা ব্যাকুলভাবে মিনতি জানালো—আমার যা জিজ্ঞাসা করবার আমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।

পরিতোষ তবু ইতস্তত করে কি বলতে যাচ্ছিল,—কিন্তু নির্মলা—

নির্মলা দৃঢ়স্বরে বললে,—কোন কিন্তু আর এতে নেই! নিন্দে গ্লানির কথা ভাবছ? যা হয়েছে তার চেয়ে আর কি বেশি হবে বলতে পারো? না পরিতোষদা, আমায় সঙ্গে যদি না নিয়ে যাও তা হ'লে এখানে মুখ দেখাতে আর আমি পারব না।

পরিতোষ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এত বড় সমস্যার এক মুহূর্তে কি মীমাংসা করা যায়? তারপর নিরুপায় হয়ে অন্য পথ না দেখতে পেয়েই বললে,—বেশ চল্ তা হ'লে। তোদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমার দায়িত্ব অন্তত শেষ হোক্!

পরিতোষ অতি বড় দুঃসাহসে সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে শুধু এই আশাতেই নির্মলাকে কোলকাতায় সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিল যে, বিজয়ের সঙ্গে একবার নির্মলার দেখা করিয়ে দিতে পারলে সমস্ত সমস্যার সহজ মীমাংসা হ'য়ে যাবে। নির্মলার যে রকম মনের অবস্থা তাতে গ্রামে তাকে রেখে আসা সত্যি সে নিরাপদও বোধ করেনি।

কিন্তু ভাগ্য যখন বিরোধী হয় তখন সামান্য একটু অপ্রত্যাশিত ঘটনার চড়ায় মানুষের সমস্ত আশা চুরমার হয়ে যায়।

একটি ছ্যাকড়া গাড়ীতে নির্মলাকে সঙ্গে করে সে বিজয়ের কোলকাতার বাসায় এসেছিল। নির্মলাকে গাড়ীতে বসিয়ে সে বিজয়ের খোঁজ করতে গেল ভেতরে; যাবার সময় বলে গেল,—তুই একটু অপেক্ষা কর নির্মলা। বিজয়ের সঙ্গে আমি আগে দেখা করে আসি! এতদিন এমন উদাসীন হয়ে থাকার কি কৈফিয়ত সে দেয় তা'ত শোনা দরকার।

বিজয়ের বাসার বাইরের বাগানে একজন মালী ফুলের গাছে জল দিচ্ছিল। তাকে ডেকে পরিতোষ বললে,—ওহে ভেতরে গিয়ে বিজয়বাবুকে একবার খবর দাও ত, বল দেশ থেকে···

তার কথা শেষ হবার আগেই মালী জানালে,—আজ্ঞে বাবুত এখানে নেই। বাইরে হাওয়া খেতে গেছেন।

পরিতোষের মনে এ সম্ভাবনার কথা একবারও উদয় হয়নি। স্তম্ভিত হয়ে সে বললে,—হাওয়া খেতে গেছেন!

পরিতোষের অবস্থা দেখে মালীরও বুঝি একটু সহানুভূতি হল। সে বিস্তারিতভাবে জানালে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুর বন্ধুদের বাড়ীর সবাই গেলেন কিনা। তাঁরও ছুটি ছিল বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

একটু চুপ করে থেকে পরিতোষ জিজ্ঞেস করলে,—কোথায় গেছেন তা জাননা বোধ হয়।

আজ্ঞে না,—সরকার মশাই থাকলে বলতে পারতেন, তিনিও এখানে নেই।

পরিতোষ হতাশ মুখে গাড়ীর কাছে ফিরে এল। তাকে আসতে দেখে নির্মলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে,—আমি এবার নামব পরিতোষদা?

পরিতোষ যথাসম্ভব হাল্কা করে বলবার চেষ্টা করলে,—না রে এখন নামা হবে না।

নির্মলার মুখ কিন্তু শুকিয়ে গেল। পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় বেদনার স্বরে সে বললে, তিনি বুঝি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান না পরিতোষদা।

পরিতোষ জোর করে হেসে উঠে বললে,—তুই পাগল হয়েছিস! সে এখানে থেকেও আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না, তা-কি হতে পারে। ছুটিতে দুদিন কোথায় বেড়াতে গেছে। ফিরে এলেই দেখা হবে।

নির্মলা ক্লান্ত বিষণ্ণ সুরে বললে,—কিন্তু আমরা এতদিন কি করব পরিতোষদা? গ্রামে ত আর ফিরে যেতে পারব না!

না রে না, গ্রামে ফিরতে হবে না। ক'টা দিন বইত নয়। এইখানেই কোথাও কাটিয়ে দেবখ'ন।—পরিতোষ এমন ভাব দেখালে যেন ব্যাপারটা মোটেই গুরুতর নয়।

কিন্তু নির্মলা অত সহজে প্রবোধ মানতে আর পারলে না। হতাশ স্বরে বললে,—তোমায় আর কত কষ্ট দেব পরিতোষদা। আমার জন্য আর কত দুঃখ লাঞ্ছনা তুমি সইবে। তার চেয়ে তুমি কোন আশ্রমে টাশ্রমে আমায় রেখে চলে যাও···

পরিতোষ হেসে উঠল,—থাক ঢের হয়েছে। আমার জন্যে আর অত ভাবতে হবে না। এখন চ দেখি, একটা আস্তানা খুঁজে বার করি।

নির্মলাকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে গাড়ীতে উঠে গাড়োয়ানকে সে আদেশ দিলে,—এগিয়ে চল গাড়োয়ান।

সম্বল আর তাদের কতটুকু। আস্তানা খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তাই এক বস্তিতে গিয়ে হাজির হতে হল। সেইখানেই বাড়িওয়ালা রাখালরাজ চক্কোত্তির সঙ্গে পরিচয়।

লোকটি কথা বলে একটু বেশী। ঘর দেখাতে নিয়ে গিয়ে টিনের চালাটার বাইরে থেকেই সে বক্তৃতা সুরু করে,—হ্যাঁ টিনের বাড়ী মশাই একশবার বলুন টিনের বাড়ী।

পরিতোষ ও নির্মলার কাছে কোন্ প্রতিবাদ না পেয়ে খুশী হয়ে সে আবার বলে,—তা যেমন গুড় তেমনি ত মিষ্টি। ঘর পিছু পাঁচ টাকায় ত আর দালান কোঠা হয় না।

পরিতোষ ও নির্মলা কোন কথা অবশ্য বলে না।

রাখালরাজ সোৎসাহে বলে চলে,—তবে একটি কথা বলে রাখছি। রাখালরাজ চক্কোত্তির কাছে কোন হাঙ্গামাটি পাকেন

না। দরকার হ'লে রাখালরাজ কানা, কালা, বোবা সব হতে জানে। এই যে আপনারা!—ভদ্রলোকের মত চেহারা অথচ উঠেছেন এসে বস্তিতে,—সঙ্গে মোটঘাটও নেই। তা আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি একবারও। কেন, করব কেন?

পরিতোষ নির্মলার দিকে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি হেনে সে আবার বলে,—যার ব্যয়রাম সে বুঝবে! আমার কি বলুন না। মাস মাস ভাড়াটি ঠিক গুণে পেলে রাখালরাজ কারোর হাঁড়িতে কাটি দিতে যায় না।

পরিতোষ ও নির্মলাকে একটু আহত ও সংকুচিতভাবে পরস্পরের দিকে তাকাতে দেখে রাখালরাজ একেবারে অন্য দিকে ঘুরে যায়।—কিন্তু খাঁটি গেরস্ত ছাড়া রাখালরাজ কাউকে ভাড়া দেয় না বুঝলেন। ও আধা সিকের কারবার এখানে নেই!

ততক্ষণে বাইরের চটের পর্দাটা সরিয়ে রাখালরাজ বাড়ীর উঠানে তাদের নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে টিনের পার্টিসান দেওয়া অনেকগুলি কামরার একটিতে তাদের নিয়ে যেতে যেতে রাখালরাজ বলে,—এই বাড়ী মশাই! আহামরিও নয়! দূর-ছাইও কেউ বলতে পারবে না। এখন আপনাদের পছন্দ হয় নেবেন, না হয়···

রাখালরাজ শেষ কথাটা উহ্য রেখেই পরিতোষের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকায়।

পাশাপাশি দুটি ঘর। এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখে পরিতোষ বলে,—না, আমরা এই ঘরই নেব ঠিক করলাম।

বেশ! বেশ!—রাখালরাজ একগাল হেসে বলে,—জানেন মশাই! এই আপনাদের মত ভদ্দরলোক ভাড়াটে পেলে আর আমি কিছু চাই না! কি বলে···

পরিতোষ রাখালরাজের উচ্ছ্বাস থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—ভাড়াটা কি আগাম দিতে হবে?

রাখালরাজ অত্যন্ত উদার হয়ে বলে,—না, না, না, না। বলেন কি! আগাম ভাড়া দেবেন কি! রাখালরাজ লোক চেনে মশাই! যখন খুশী আপনি ভাড়া দেবেন।

ঘরের দরজায় ঘোমটা ঢাকা একটি মূর্তিকে কিছুক্ষণ থেকে

দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই ঘোমটার ভেতর থেকে অত্যন্ত তীব্র শাসনের তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যায়—এদিকে একবার এস ত!

রাখালরাজের চেহারা এক মুহূর্তে বদলে যায়। থতমত খেয়ে ঢোক গিলে হাত কচ্‌লে সে আমতা আমতা করে বলে,—ওইটি, ওইটি—কি বলে, আমার পরিবার! আর দেখুন—মানে কিছু যদি মনে না করেন,—এই বলছিলাম কি, অসুবিধে না হলে ভাড়ার টাকাটা যদি···

পরিতোষ ব্যাপারটা বুঝে হেসে বলে,—না, না। ভাড়া আমি আগামই দিচ্ছি।

ভাড়ার টাকাটা গুণে নিয়ে পরিবারের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রাখালরাজ বলে,—তা হলে আর কি, ঘর ত হয়ে গেল, এবার জিনিষপত্তর সব আনিয়ে ফেলুন। কি বলে,—ঘর সংসার ত আর হাওয়ায় পাতা যায় না। বলেন ত আমিই সব ব্যবস্থা···

নির্মলা দূরের একটি জানালার দিকে গিয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দিকে চেয়ে পরিতোষ গম্ভীর মুখে বলে,—না থাক, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

রাখালরাজের আরো একটু ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এদের ভাবগতিক দেখে হতভম্ব হয়ে সে বেরিয়ে যায়।

নির্মলা ও পরিতোষের গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার খবরটা রটে যেতে বেশী বিলম্ব হয় নি। নানাজনের কল্পনায় ব্যাপারটা ইতিমধ্যে যথাসম্ভব বিকৃত ও রসাল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে! গ্রামের মাতব্বররাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেন নি। আচার্যিমশাই সদলদলে একেবারে জমিদারের কাছারীতে গিয়েই কথাটা তোলেন,—আজ্ঞে বড় কুৎসিত, বড় নোংরা ব্যাপার, কিন্তু তা'বলে অবহেলা ত করা যায় না। এ রকম ব্যভিচার, কি বলে সমস্ত গ্রামের কলঙ্ক। সমাজপতি হিসাবে আমাদের একটা কর্তব্য ত আছে।

বেণীখুড়ো সায় দিয়ে বলেন,—আলবৎ, এর উচিত সাজা দরকার, একেবারে ঢিট্ করে দিতে হবে।

জমিদার মশাই এতক্ষণেও কোন কথা বলেন নি। তাঁর বদলে

শশীভূষণই জবাব দেন,—কিন্তু যাদের ঢিট্ করবেন, তারা ত পগার পার! পরিতোষ আর নির্মলাকে পাচ্ছেন কোথায়?

গণেশলাল সোৎসাহে সে সমস্যার সমাধান করে দেয়,—কেন? নির্মলা না থাক তার বাপ ত আছে, যাকে বলে মধ্বাভাবে গুড়ম্ দদ্যাৎ।

আচার্যিমশাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন,—আঃ গণেশ!

কিন্তু গণেশের উদ্যম এখন থামায় কে? সে অদম্য উৎসাহে বলে,—মানে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, মানে—মানে কেঁচো খুঁড়তে সাপ আর কি?

উপস্থিত সকলের মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব দেখে গণেশলাল শেষ পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে।

জমিদার মশাই গম্ভীর ভাবে বলেন,—তা'হলে নির্মলার বদলে তার বাপকে শাস্তি দিতে পারলেই আপনারা খুশী!

বেণী খুড়ো সানন্দে জানান, নিশ্চয়ই! রীতিমত একেবারে ধোপা নাপিত বন্ধ।

জমিদার মশাই খানিক চুপ করে থেকে বেশ কঠিন স্বরে বলেন,—বেশ তা'হলে আমার কাছে সময় নষ্ট না করে ধোপা নাপিতের কাছেই যান।

সকলে একেবারে হতভম্ব। আচার্যিমশাই অত্যন্ত বিমূঢ়-ভাবে বলেন,—আজ্ঞে ধোপা নাপিতের কাছে।

জমিদার মশাই কোন উত্তরই দেন না। শশীভূষণই কথাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন—সোজা কথাটা বুঝতে পারলেন না আচার্যিমশাই, ধোপা নাপিত বন্ধ করতে হলে তাদের মতামতটা আগে দেওয়া দরকার নয় কি?—যান্ যান্ দেরী করবেন না, ধোপা নাপিত আবার খুঁজে বার করতে হবে ত?

খানিক নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে থেকে আচার্যি মশাইকে সদলবলে এবার বিদায় নিতে হয়। যাবার সময় নমস্কারটা করে যাবার কথাও তাদের মনে থাকে না।

সবাই চলে যাবার পর জমিদার আসন থেকে উঠে পড়ে বলেন, এরা আর যেন আমায় বিরক্ত করতে না আসে শশী।

শশীভূষণ ঘাড় নেড়ে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তারপর একটু মাথা চুলকে বলে—কিন্তু আমি ভাবছিলাম !

কি ভাবছিলে ?—গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করেন চৌধুরি মশাই।

না, ভাবছিলাম, শরীরটা কেমন কদিন জুৎ নেই, দুদিন একটু বাইরে ঘুরে এলে হত। এই বিজয় এখন যেখানে হাওয়া খেতে গেছে। গাঁয়ের খবরাখবরটাও ত তার পাওয়া দরকার।

জমিদার খানিক শশীভূষণের দিকে নীরবে চেয়ে থাকেন। তারপর মুখে কোন ভাবান্তর প্রকাশ না করেই বলেন,—বেশ যেতে পার।

চৌধুরী মশাই আর সে ঘরে দাঁড়ান না।

শশীভূষণ আপন মনে একটু হেসে সেই পুরাণ গানটাই গুন গুন করে গান।

গ্রামে যাওয়া তার নিষেধ। নির্মলার কোন খোঁজও সে পায় নি। অত্যন্ত মনমরা অবস্থায় রাজীববাবুদের সঙ্গে তাঁদের দার্জিলিঙ-এর বাড়ীতে ছুটিটা কাটাবার নিমন্ত্রণ বিজয় তাই আর প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি।

রাজীববাবুদের এই দার্জিলিঙ-এর বাড়ীতেই একদিন শশীভূষণ হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়।

বিজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—কি ব্যাপার শশীকাকা ! তুমি হঠাৎ এসে হাজির যে, সব খবর ভালো ত ?

শশীভূষণ হেসে বলেন,—ভাল বাবা সব ভাল। আমি এই এমনিই এসে পড়লাম। কাজ কর্ম এখন মন্দা, তাই ভাবলাম দু'দিন তোমাদের এখান থেকে ঘুরে যাই। ওই তোমাদের কি বলে, হাওয়া বদল করে ভাঙ্গা শরীরটা যদি একটু মেরামত করা।

একটু চুপ করে থেকে বিজয়ের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বলেন,—তা ছাড়া গাঁয়ে ক'দিন যা হৈ হুজুগ গেল, বেরুবার জন্য প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল।

গাঁয়ে আবার কি হল ? সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে বিজয়।

সে সব নোংরা কথা শুনে তোমার আর কাজ নেই। ছুটিতে

গাঁয়ে যাওনি ভালই করেছ। গেলে মিছিমিছি মেজাজটা বিগড়ে যেত। আমরাই ত থ বনে গেছি।

একটু হেসে যেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শশীভূষণ আবার বলেন,—এমন নিষ্কলঙ্ক সৎ ছেলে বলে যাকে জানতাম···

বিজয় বাধা দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে,—বলতে হয় একটু স্পষ্ট করে বল কাকা, কার কথা বলছ ?

ওই তোমাদের পরিতোষ গো, তার পেটে পেটে এত ছিল, কে জানত ?—শশীভূষণের মুখ দিয়ে যেন হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে যায়।

কি করেছে সে ?—দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করে বিজয়।

শশীভূষণ যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে বলেন আমার এ সব কথা না তোলাই ভাল ছিল দেখছি, তোমার ছেলেবেলার বন্ধু।

বিজয় আবার বাধা দিয়ে উচ্চস্বরে বলে,—হ্যাঁ সেই জন্যই সব কথা শোনা দরকার। গাঁয়ের সবাই তার বিরুদ্ধে আমি জানি। সবাই মিলে পিছু লেগে তাকে গাঁ ছাড়া করেছে বোধ হয়।

শশীভূষণ এবার যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই গলা একটু চড়িয়ে রাগের সঙ্গে বলেন,—গাঁ তাকে ছাড়তে হয়নি, সে নিজেই গাঁ ছেড়েছে। আর একা নয়,—একটি মেয়েকে নিয়ে। একজন দেবতুল্য ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করে।

শশীকাকা !—বিজয় রুক্ষস্বরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

শশীভূষণ যেন অত্যন্ত আঘাত পেয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বলেন, ওই জন্যই ত আমি কিছু বলতে চাইনি আগে। তুমি নেহাৎ বলিয়ে ছাড়লে—আর লুকিয়েই বা রাখব কেন ? কি ভয়ানক অন্যায় বল দেখি। পুরুত মশাই-এর মুখের দিকে ত তাকান যায় না।

বিজয়ের মুখ হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়,—পুরুতমশাই ! কি বলছ কাকা ?

তবে আর কি শুনছ। পুরুতমশায়ের একটি মেয়ে ছিল না ? তাকে নিয়েই ত পরিতোষ আজ ক'দিন নিরুদ্দেশ !—শশীভূষণ কথাগুলি তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন।

নির্মলা—বিজয় আর কিছু বলতে পারে না।

শশীভূষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েই বলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নির্মলাই তার নাম। এখন ত শোনা যাচ্ছে অনেক দিন আগে

থেকেই ওদের ভেতরে ভেতরে এ সব চলেছে। এখন শুধু কেলেঙ্কারীটা আর চাপবার উপায় নেই বলেই গা ঢাকা দিয়েছে বাধ্য হয়ে।—কেন বলা যায় না বিজয়ের চোখের দিকে শশীভূষণ আর চাইতে পারেন না। বিজয় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শশীভূষণ একটু চুপ করে থেকে বলেন—যাকগে, তুমি আর মিছিমিছি ওদের কথা ভেবে মন খারাপ করো না।

হঠাৎ বিজয় হেসে ওঠে উচ্চৈস্বরে। শশীভূষণও সে হাসিতে চমকে ওঠেন।—তুমি পাগল হয়েছ কাকা! যার খুশী সে জাহান্নমে যাক—আমার কি এসে যায়!—বলে বিজয় আবার হেসে ওঠে। সেই হাসির সঙ্গেই আর একটি তরল মিষ্টি হাসি শোনা যায়। দমকা হাওয়ার মত উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে ঘরে ঢুকে বিজয়ের হাত ধরে বুলা বলে,—বিজয়দা শীগ্‌গির দেখবে এস চুপি চুপি! যা একটা মজা হয়েছে—

কোথায় কি মজা হয়েছে?—বিজয়কে যেন অত্যন্ত উৎসাহী বলে মনে হয়।

মা একটা বেদেনিকে ধরে দিদিকে—তুমি এসই না—বুলা আর কথাটা শেষ না করেই বিজয়কে টানতে টানতে নিয়ে যায়। দূর থেকে তাদের হাসির শব্দ শোনা যায়। শশীভূষণকে কিন্তু কেন বলা যায় না মোটেই খুশী মনে হয় না। কেমন আচ্ছন্নের মত আড়ষ্টভাবে তিনি বসে থাকেন।

বিজয়কে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গিয়ে, চুপ করে থাকবার ইসারা করে বুলা এক জায়গায় দাঁড় করায়। সেখান থেকে দেখা যায় হেমাঙ্গিনী একজন বেদিনী ডাকিয়ে অনিমাকে একটা তাবিজ বাঁধবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।

অনিমাও তাবিজ কিছুতেই পরবে না, হেমাঙ্গিনীও ছাড়বেন না। বলেন,—কেন, একটা তাবিজ পরলে কি হয়? হাত ত তাতে ক্ষয়ে যাবে না?

অনিমা মায়ের সব অত্যাচার সহ্য করলেও এ ব্যাপারে বিদ্রোহী হয়ে ভ্রূকুটি করে বলে,—না, তাবিজ পরতে যাব কেন?

বেদিনী উৎসাহ দিয়ে বলে,—পরলে ভালো হোবে। জলদি

জলদি সাদি হোবে। রাঙা দুলহা আসবে! এ তাবিজের বহুত গুণ।

বেদিনী তাবিজটা বাঁধবার চেষ্টা করতেই ঝাঁকানি দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিয়ে অনিমা বলে,—দরকার নেই অমন গুণের তাবিজ!

দরকার নেই কি রকম!—হেমাঙ্গিনী এবার রীতিমত রেগে ওঠেন। বেদিনীর হাত থেকে তাবিজটা নিয়ে নিজেই জোর করে অনিমার হাতে বেঁধে দিয়ে বলেন,—আমি এত কষ্ট করে বেদিনী ডাকিয়ে আনলাম কি অমনি!

অনিমার তখনকার মুখের অবস্থা সত্যি দেখবার মতন। বিজয় আর বুলা হাসি চাপতে পারে না। সে হাসির শব্দে তাদের দেখতে পেয়েই অনিমা আর মার শাসনও মানে না। সেখান থেকে একেবারে নিজের ঘরের দিকে ছুট দেয়।

হেমাঙ্গিনীও হাসির শব্দে ফিরে তাকান। তারপর সরোষে সকল গোলমালের মূল বুলাকে দেখতে পেয়ে ডাক দেন—বুলা!

কিন্তু বুলার কি আর তখন পাত্তা আছে! বিজয়কে নিয়েই সে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছে।

অনিমা লজ্জায় নিজের ঘরে গিয়ে একটু বুঝি নিরাপদ বোধ করছিল। এখানে কেউ তাকে অনুসরণ করে আসবে সে ভাবে নি। হাতের দিকে চেয়ে তাবিজটা ছিঁড়ে ফেলবে কি না ভাবছে, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে সে চমকে ওঠে। বিজয় আর বুলা সেখানে কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয় দুষ্টুমির হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে,—দেখি অনিমা, তোমার হাতে ওটা কি?

বুলা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

অনিমা অত্যন্ত বিব্রত হয়ে এক মুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়েই পাশের দরজা দিয়ে ছুটে একেবারে বাইরে বেরিয়ে যায়। বিজয়ও কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। কি যেন নতুন উত্তেজনা আজ তার মধ্যে এসেছে। এঘর ওঘর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে শেষ পর্যন্ত বাইরের বাগানে গিয়ে একটি নির্জন বেঞ্চিতে অনিমাকে ধরে ফেলে সে বলে, এইবার।

বিজয় এমনভাবে কোন দিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। অনিমা

লজ্জায় মাথা নিচু করে বলে,—না, আমি যাই। বিজয় কিন্তু জোর করেই তাকে বসিয়ে রেখে হেসে বলে,—না যেতে দেব না।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে অনিমার হাতের তাবিজটা দেখিয়ে বলে, —এই বুঝি তোমার বর ধরবার ফাঁদ ?

বিজয়ের গলার স্বরে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অনিমা তার দিকে তাকায়। বিজয় হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার তাবিজটা ধরে ফেলে কঠিন স্বরে বলে,—এ তাবিজ যদি আমি ছিঁড়ে ফেলে দিই ! যদি বলি আমায় ধরবার জন্যে কোন ফাঁদ তোমার লাগবে না, কোন কৌশলের দরকার নেই !

অনিমা চমকে উঠে সন্ত্রস্তভাবে তার দিকে তাকায়। বিজয় সত্যিই তাবিজটা ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে বলে,—মা কি বলবেন ভাবছ। মা কোন কিছু বলবেন না, তিনি যদি জানেন তোমায় বিয়ে করবার জন্যে কোন তাবিজ, কোন তুকতাকের সাহায্য আমার লাগবে না।

অনিমা কম্পিত-কাতর স্বরে বলে, তুমি কি বলছ !

বিজয় যেন হঠাৎ আরো উগ্র হয়ে ওঠে,—কি বলছি ! কেন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করবার মত লোক নই ! হৃদয় নিয়ে খেলা করাই আমার ব্যবসা ! ভালবাসার ভাণ করে শেষ পর্যন্ত আমি নির্মমভাবে প্রতারণা করেই বেড়াই !

একটু থেমে সে যেন আরো হিংস্রভাবে বলে,—বেশ ! কঠিন ভাবে সে কথা আমায় শুনিয়া দাও ! আপমান করে আমায় তাড়িয়ে দাও।

অনিমার চোখ সজল হয়ে আসে। মুখ নামিয়ে অশ্রু গোপন করবার চেষ্টা করে সে বলে,—আমি তা ত বলি নি। আমি শুধু ভেবেছিলাম···

কি তুমি ভেবেছিলে ? বিজয় প্রায় চীৎকার করে ওঠে।

তার দিকে কাতর চোখ তুলে অনিমা দ্বিধাজড়িত স্বরে বলে, আমি ভেবেছিলাম, তোমার মনে হয়তো আমার জায়গা হবে না।

বিজয় অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ? তার দৃষ্টিও ধীরে ধীরে যেন সজল হয়ে আসে। কোমল

গলায় সে এবার বলে,—কেন জায়গা হবে না, অনিমা? আমি নিজে যে নিরাশ্রয়। জীবনে শুধু আঘাতই পেয়েছি। সে আঘাত, সে বঞ্চনার ব্যথা তুমিই শুধু জুড়িয়ে দিতে পার অনিমা। তোমায় কাছে পেয়ে আমি হয়ত সব ভুলতে পারব।

বিজয় অনিমার হাতটা নিজের কাছে টেনে নেয়। হঠাৎ পাশ থেকে বুলার হাসির শব্দ শোনা যায়। সে কখন লুকিয়ে এসে সেখানে বসেছে কেউ জানে না। অনিমা কিছু বলবার আগেই সে চারিদিক আনন্দের হাসিতে মুখর করে ছুটে পালিয়ে যায়।

বিজয়ের কোলকাতা ফেরার অপেক্ষায় পরিতোষ আর নির্মলা এখনও পর্যন্ত দরিদ্র বস্তির সেই বাড়িতেই বাস করছে। নির্মলার সন্তান সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পরিতোষের যৎসামান্য উপার্জনে কোন মতে তাদের দিন চলে। এই দারিদ্র, দুঃখ, কষ্ট, গ্লানির মধ্যে সন্তানের মুখের দিকে চেয়েই যা কিছু সান্ত্বনা নির্মলা পায়। অভাব অনটন যখন দুঃসহ হয়, তাকে ও পরিতোষকে জড়িয়ে সাধারণের স্বাভাবিক সন্দেহ যখন অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে, তখন একটি মাত্র ক্ষীণ আশা সম্বল করে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে সে এই কঠিন পরীক্ষার দিন পার হবার শক্তি সংগ্রহ করে। পরিতোষের মনে কিন্তু যেন কোন হতাশা, দুঃখ বা সংশয় নেই। সারাক্ষণ হাসিমুখে কি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এই দুঃখের সংসার সে চালাবার চেষ্টা করে তা দেখে নির্মলার মন শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তার ও তার সন্তানের জন্যে পরিতোষের এই আত্মত্যাগে নির্মলার এক দিক দিয়ে অবশ্য কুণ্ঠার সীমা নেই। এই মানুষটিকে এমন ভাবে বিব্রত করার কোন অধিকার ত তার নেই। তার মহত্ত্বের ওপর এই বোঝা আর কত দিন সে চাপিয়ে রাখবে! কিন্তু উপায়ই বা কি? এখনও পর্যন্ত বিজয় কোলকাতায় ফেরেনি। কবে যে ফিরবে তাও নির্মলা জানে না।

সেদিন সকালে বাসন-কোষনগুলো মেজে ঘরের তাকে তুলে রাখতে এসে নির্মলা দেখে দোলনায় শোয়ান তার ছেলেটির হাতে

একটা নতুন খেলনা দিয়ে পরিতোষ তাকে আদর করছে। মৃদু ভৎর্সনা সুরে নির্মলা বললে,—পরিতোষদা, আবার বুঝি খোকার খেলনা কিনে এনেছ!

আহা কি সামান্য একটা খেলনা!—পরিতোষ যেন লজ্জিত।

এইবার খোকার মাথায় একটা নতুন রঙিন টুপির দিকে নির্মলার দৃষ্টি গেল। বললে,—সামান্য একটা খেলনা! আর ওই টুপিটা কেন?

পরিতোষ যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল,—ওই রাস্তায় বিক্রি করছিল, সস্তায় পেয়ে গেলাম তাই। তাতে হয়েছে কি?

নির্মলা কিন্তু সত্যি এবার যেন অসন্তুষ্ট হল। পরিতোষ অসামান্য পরিশ্রম ক'রে কি ভাবে যে তাদের সংসার চালাচ্ছে তা আর জানতে বাকী নেই নির্মলার, তাই একটু রাগ করেই সে বলে—হয়েছে কি! এসব বাজে খরচ করবার কি দরকার ছিল বলত?

একটা টুপি কিনলেই বাজে খরচ হ'ল?—পরিতোষ কথাটা এড়িয়ে যেতে চায়।

কিন্তু নির্মলা তাকে সে সুযোগ দিলে না—কই? তোমার যে জুতো কেনবার কথা, তা কিনেছ?

জুতো?—পরিতোষ যেন অবাক হয়ে বললে,—জুতো এখুনি কেনবার কি দরকার! দেখলাম এ জুতোটায় তালি দিলে এখনও মাসখানেক বেশ চলে যাবে।

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে নির্মলা বললে,—না, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় পরিতোষদা। ওই ছেঁড়া পেরেক ওঠা জুতো নিয়ে সারাদিন তোমায় কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবু তুমি জুতো না কিনে একটা টুপি কিনে পয়সা নষ্ট করে এলে। কি হবে ওই বাহারের টুপিতে?

একটু চুপ করে থেকে সে আবার ধরা গলায় বললে,—গরীবের ছেলের ওসব লাগে না।

এবার পরিতোষই যেন রাগ করে উঠল, গরীবের ছেলে গরীবের ছেলে, করিসনি নির্মলা। তোর বাপ গরীব হতে পারে, কিন্তু ওর বাপ-ঠাকুরদা ওকে অমন একটা ন্যাকড়ার টুপির বদলে সোনার টুপি পরাতে পারে।

কথাটা তারপর ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টাতেই পরিতোষ বললে, আর দেখ নির্মলা, আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম, এ বেটা ঠিক একটি ক্ষুদে জমিদার মশাই হবে ; একেবারে ঠাকুরদার নূতন সংস্করণ !

খোকার নাকটা ধরে আদর করে পরিতোষ আবার সস্নেহে বললে,—কেমন ঠিক কিনা ? তুই দেখ নাকটা।

আহা কি নাক !—নির্মলা কথাটাকে যেন আমল দিতেই চাইলে না, ফিরে প্রশ্ন করলে,—কিন্তু তোমার এত খুশী ভাব কেন আজ বল ত।

পরিতোষ এবার বেশ একটু রহস্যময় হয়ে উঠে বললে—ও সেই কথাই তোকে বলিনি বুঝি ! জানিস,—না থাক, এসেই বলব !—পরিতোষ যেন একটু ইতস্তত করে চুপ করে গেল।

কি বলই না পরিতোষদা, শুনি।—নির্মলা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

একটু বুঝি আর ধৈর্য ধরতে পারলি না ?—পরিতোষ হেসে উঠল,—শোন তা হলে, বিজয় কোলকাতায় এসেছে খবর পেয়েছি। আমি এখুনি যাচ্ছি দেখা করতে। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। বাপ-বেটায় দেখা হবে, তাই ত বেটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে গেলাম একটু ! খোকাকে আর একবার আদর করে হাসতে হাসতে পরিতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্মলা বুঝি নিজের হৃদয়ের অকস্মাৎ উদ্দাম স্পন্দন দমন করতে না পেরেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পরিতোষ অনেক আশা করেই বিজয়ের কোলকাতায় আসার সংবাদ পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছল। সেখানে অত বড় স্বপ্নভঙ্গের আঘাত যে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সে কি করে জানবে !

পরিতোষ যখন বিজয়ের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছোল তখন সেখানে বাইরে একটি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। পরিতোষ প্রবেশ করবার আগেই বাড়ীর ভেতর থেকে একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিজয়কে সেজেগুজে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পরিতোষ সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ডাকলে,—বিজয় !

বিজয় কিন্তু তাকে যেন দেখতে না পেয়ে ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলে গেল! পরিতোষ অত্যন্ত অবাক হয়ে পেছন থেকে আবার বললে,—বিজয়, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ভদ্রমহিলা আর কেউ নয়, অনিমা। সে-ই এবার বিজয়ের দৃষ্টি পরিতোষের দিকে আকর্ষণ করে বললে,—তোমায় ভদ্রলোক যেন কি বলছেন।

বিজয় একবার ভ্রূকুটি করে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে অনিমাকে বললে,—আচ্ছা, তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো, আমি আসছি।

অনিমা গাড়ীর দিকে চলে যাবার পর বিজয় অত্যন্ত কঠিন অপ্রসন্ন মুখে পরিতোষের সামনে এসে দাঁড়াল।

পরিতোষ নির্বোধ নয়। বিজয়ের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হয়ে সে বললে,—আমায় দেখে তুমি খুশী হও নি মনে হচ্ছে বিজয়।

সেটা যখন বুঝতেই পেরেছ, তখন আর বলে লাভ কি!—বিজয়ের কণ্ঠস্বরে গভীর বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই।

পরিতোষ সত্যি বিমূঢ় হয়ে গেল। বিজয়ের দিকে খানিক চেয়ে থেকে আহত স্বরে বললে,—কিন্তু তোমার এ ব্যবহারের কারণ ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

সে বোঝবার ক্ষমতা তোমার থাকলে নির্লজ্জের মত তুমি এখানে আসতে সাহস করতে না—বিজয়ের কণ্ঠ যতদূর তিক্ত হতে হতে পারে।

পরিতোষ অসহায় ভাবে বললে,—তুমি কি বলছ বিজয়! এসব কথার অর্থ কি?

তোমার কাছে অর্থ ব্যাখ্যা করবার সময় আমার নেই পরিতোষ। আমায় তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

অত্যন্ত রুক্ষভাবে কথাগুলো বলে বিজয় চলে যাবার উপক্রম করতেই পরিতোষ কাতর স্বরে বলে,—কিন্তু আমি যে তোমার জন্য আজ পাঁচ মাস অপেক্ষা করে আছি বিজয়, আমার যে অনেক কথা আছে।

তোমার অনেক কথা থাকতে পারে, কিন্তু আমার সময় বা উৎসাহ কিছুই নেই, আমি চল্লুম।

বিজয়কে সত্যিই চলে যেতে উদ্যত দেখে পরিতোষ কাতরভাবে বললে,—তুমি কি হয়েছ, বিজয়! এ যে আমার ধারণার অতীত? শোন, আমি নির্মলার কাছ থেকে আসছি।

বিজয় তাকে রূঢ়স্বরে বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে,—তুমি জাহন্নম থেকে এসেছ, সেইখানেই যেতে পার। আমার সে সব কথা শোনবার দরকার নেই।

পরিতোষ বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত হয়ে বললে,—তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলের কথাও শোনবার দরকার নেই? তোমার জন্যে পরিচয়, আশ্রয় সব খুইয়ে যারা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি তাদের স্বীকার করতে চাও না?

বিজয় পরিতোষের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে তিক্তস্বরে বললে,—তোমার অভিনয়ের ক্ষমতা আছে বটে পরিতোষ। একদিন তোমার মহত্ত্বে তাই সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু আজ তোমার ও বক্তৃতায় আমায় ভোলাতে পারবে না। শোন, আমার স্ত্রীকে আমি অবশ্যই স্বীকার করি এবং তিনি ওইখানে ওই গাড়ীতে বসে আছেন।

পরিতোষ স্তম্ভিত হ'য়ে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার স্ত্রী! তুমি বিয়ে করেছ?

তা না হ'লে কি সেই কুলটার শোকে সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকব মনে করেছিলে! যাও—এ খবরটা তোমার নির্মলাকে দাওগে যাও।—তীব্র বিদ্রূপে পরিতোষকে আহত করে বিজয় সেখান থেকে চলে গেল।

পরিতোষ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল আচ্ছন্নের মত।

বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে আসবার কথা বলে পরিতোষ সেই সকাল-বেলা বেরিয়েছিল, ফিরে এল যখন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সারাদিন কোথায় কি ভাবে যে সময় তার কেটেছে সে যেন নিজেই স্মরণ করতে পারে না।

দুর্ভাবনা আশঙ্কার মাঝে নির্মলার সারাদিন কেটেছে

নিদারুণ উৎকণ্ঠায়। পরিতোষের ফিরতে যত দেরী হয়েছে তত সে অস্থির হয়ে উঠেছে সংশয়ে, শঙ্কায়, দুর্ভাবনায়। এতক্ষণে পরিতোষকে ফিরতে দেখে অনেক কথাই একসঙ্গে বলবার জন্যে সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে সে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। সে মুখ দেখে বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন বিবরণই যেন তার জানতে বাকি থাকে না। প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করে সে সহজ গলায় হালকা করে বলবার চেষ্টা করে,—বাঃ বেশ লোক ত? আমি সেই তখন থেকে বসে বসে খালি ঘড়ি দেখছি। সেই সকালে বেরিয়েছ আর এই বিকেলে তোমার ফিরে আসার সময় হলো?

পরিতোষ কোন উত্তর দেয় না। আচ্ছন্নের মত ঘরের এক কোণে ঘাড় গুঁজে বসে থাকে।

অনেকক্ষণ ঘরে আর কোন শব্দ শোনা যায় না। নির্মলা তারপর বুঝি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। অস্ফুট কাতর স্বরে ডাকে,—পরিতোষদা—

পরিতোষের তবু যেন কোন সাড়া নেই। ধরা গলায় ধীরে ধীরে নির্মলা বলে,—তোমার সঙ্গে বুঝি দেখা করলে না?

পরিতোষ এবার তার দিকে ধীরে ধীরে মুখ ফেরায়, বলে,—দেখা না করলেই ভাল ছিল বোধ হয়,—তার গলার স্বরে বিষাদ ও তিক্ততার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে আবার বলে,—সে তোমার নাম শুনতেও চায় না নির্মলা, সে আবার বিয়ে করেছে।

নির্মলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে তার অশ্রু নেই, মুখে কোন ভাবান্তর নেই, মনে হয় সে মুখ যেন পাথর দিয়ে তৈরী। অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে বলে,—আমি জানতাম!

অভিমানে বেদনায় পরিতোষের স্বর জ্বালাময় হয়ে ওঠে,—জানতে? তা হলে আমায় সেখানে যেতে বারণ করনি কেন নির্মলা! যেচে তোমার এ অপমান তা'হলে নিয়ে আসতে আমায় হ'ত না। তীব্রভাবে কথাগুলো বলে পরিতোষ আবার যেন ভেঙ্গে পড়ে। শুধু তার মুখ দিয়ে গভীর আক্ষেপের মত বার হয়,—ওঃ এতবড় পাষণ্ড সে হ'তে পারে আমি ভাবতে পারিনি।

আমার সমস্ত শরীর যেন তার কাছে দাঁড়িয়ে অশুচি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

নির্মলা আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ে। রুদ্ধ কান্নার আবেগে তার সমস্ত দেহ শুধু ফুলে উঠতে থাকে। পরিতোষ তার পাশে গিয়ে বসে তার গায়ে হাত রাখে। তার সহানুভূতিও কিন্তু বিজয়ের ওপর ঘৃণায় বিদ্বেষে অন্য এক রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়,—কার জন্য তুই কাঁদছিস নির্মলা? সত্যই মনে কর তোর বিয়ে হয়নি। ওকে তোর স্বামী বলে ভাবতেও ঘৃণা হওয়া উচিত।

নির্মলা হঠাৎ অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ তুলে বলে,—না, না ও কথা বোলো না।

বলব না! একশোবার বলব। পরিতোষ উগ্র হয়ে ওঠে,—নিজের শয়তানী মতলব হাসিল করতে ফাঁকি দিয়ে যে দুটো মন্ত্র পড়বার ভাণ করলে সেই তোর স্বামী—আর আর—

কি যেন বলতে গিয়ে পরিতোষ হঠাৎ থেমে যায়। তারপর নিজেকে সম্বরণ করার জন্যই যেন সেখান থেকে সরে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত ঘর আবার নিস্তব্ধ।

সে নিস্তব্ধতা কিছুক্ষণ বাদে ভাঙে বাইরের একটি বালিকার ডাকে। গোয়ালাদের মেয়ে দুধ দিতে এসেছে। বাইরে থেকে সে ডাকে,—কই গো দুধ নিয়ে যাও না।

কারুর কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে সে ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে,—বা রে! বর-বৌ মিলে এ-ঘরে বসে গল্প হচ্ছে আর আমি চেঁচিয়ে মরছি! পরিতোষ আর নির্মলার সংকুচিত দৃষ্টি একবার পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়। মেয়েটি আবার খেঁকিয়ে ওঠে,—কোথায় দুধ রাখব বল? শান্তস্বরে নির্মলা বলে,—ও ঘরে বাটি আছে, তাইতে ঢেলে রেখে যা। ঈস, নিজে বুঝি আর বরের কাছ থেকে উঠতে পারলে না,—মুখ-ভঙ্গি করে মেয়েটি ঘর থেকে দুধের বালতি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

নির্মলা আর পরিতোষ অনেকক্ষণ কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারে না। অনেকক্ষণ বাদে পরিতোষই প্রথম নির্মলার দিকে

এগিয়ে আসে। তার মুখে যেন একটা নূতন সংকল্পের দৃঢ়তা। এমন দৃষ্টি তার চোখে কোনদিন দেখা যায় নি,—তোমার এখনো হয় ত এ-সব শুনলে লজ্জা করে নির্মলা ; কিন্তু আমার আর করে না। আমি জানি—এই গ্লানির মধ্যেই আমাদের বাস করতে হবে চিরদিন। আমাদের আর কোন সম্পর্ক কেউ কখনো বিশ্বাস করবে না।

পরিতোষ একটু চুপ করে থেকে যেন নতুন শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে এক নিশ্বাসে বলে যায়,—তাই ভাবি, কেন এ সম্পর্ক আমরা সত্য করে তুলব না ? যা মিথ্যে গ্লানি হয়ে আছে তা কেন সত্যে মধুর হয়ে উঠবে না !

নির্মলা সচকিতভাবে পরিতোষের দিকে মুখ তুলে তাকায়—সে দৃষ্টিতে বিস্ময় না আতঙ্ক, বেদনা না বিমূঢ়তা, কি যে সব চেয়ে প্রধান স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। পরিতোষ উত্তেজিতভাবে বলে—ভাবছ, কি আমি বলছি ! তার গলার স্বর কাতর হয়ে আসে। এ-সব কথা কোনদিন হয় ত বলতাম না, বলবার প্রয়োজনও হত না। দুর্বলতা বল, পাগলামি বল, দিনের পর দিন তোমার পাশে থেকে তোমায় দেখে আমার মনের মধ্যে যে আকুলতা জমে উঠেছে কোনদিন তোমার কাছে তা প্রকাশ করতাম না। কিন্তু আজ সমাজ সংসার সবাই আমাদের ত্যাগ করেছে ; কোথাও আমাদের জায়গা নেই। এই নির্মম উদাসীন পৃথিবীতে পরস্পরের হাত ছাড়া আর আমাদের ধরার আর কিছু নেই। আজ আর তাই নিজেকে সংবরণ করতে পারছি না।

পরিতোষ এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর ব্যাকুলতায় তার গলার স্বর আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।—কেনই বা সংবরণ করব নির্মলা ! সমস্ত পৃথিবী আমাদের অস্বীকার করেছে, আমরা কেন সমস্ত পৃথিবীকে অস্বীকার করব না। কেন আমরা তাদের দেওয়া অপমান গ্লানিকে উপেক্ষা করে নতুন করে নিজেদের জীবন গড়ে তুলব না।

পরিতোষ থেমে যায়। নির্মলা ধীরে ধীরে তার অশ্রু সজল চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়। সে অশ্রু অপ্রত্যাশিত আঘাতের না সমবেদনার কে জানে।

পরিতোষ তার কাছে গিয়ে বসে ধীরে ধীরে বলে,—আমি জানি তোমার মনে আমার সে রকম কোন স্থান নেই। হয়তো শুধু একটু শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছু দাবী করতেও আমি পারি না। তবু কোন দিন শ্রদ্ধার চেয়ে বেশী কিছু পাব, এই আশাই আমার কাছে যথেষ্ঠ নির্মলা।

কথাগুলি বলেই পরিতোষ উঠে পড়ে। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলে যাবার পথে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে,—এ সব কথায় তোমার যদি আঘাত লেগে থাকে, তাহ'লে শুধু এই ভেবেই ক্ষমা করো যে, আমিও সামান্য দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। একটু স্নেহ, একটু ভালবাসার ক্ষুধা আমি জয় করতে পারিনি।

পরিতোষ আর সেখানে দাঁড়ায় না।—তোমার উত্তর এখুনি আমি চাই না নির্মলা, তার জন্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য আমার আছে—কোনমতে এই কথাগুলি বলেই নিজের ঘরে চলে যায়। নির্মলা যেমন মুখ ফিরিয়ে বসেছিল তেমনি ভাবেই নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে।

রাত গভীর হয়। মনের মধ্যে সারাদিন যে ঝড় তার গেছে, তারই আঘাতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পরিতোষ কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, সে নিজেই জানতে পারে না। হঠাৎ কি একটা আওয়াজে ধড়মড় করে সে উঠে বসে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমটা সে বুঝতে পারে না, বাইরে না মনের ভিতরই একটা প্রচণ্ড ঝড় চলছে। নির্মলার ঘরে আবার একটা আওয়াজ শোনা যায়। পরিতোষ উদ্বিগ্নভাবে ডাকে,—নির্মলা!

কোন সাড়া নেই নির্মলার!

পরিতোষ উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার তাকে ডাকে, এবারও কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। টিনের চাল কাঁপিয়ে দমকা একটা ঝোড়ো হাওয়া যেন আর্তনাদ করে যায়। নির্মলার ঘরে আবার সেই শব্দ।

পরিতোষ আর দ্বিধা না করে মাঝের দরজাটা খুলে নির্মলার ঘরে গিয়ে ঢোকে। ঝড়ের বেগে ঘরের একটি জানলার পাল্লা দুটি সশব্দে খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই শব্দই সে পাশের ঘর থেকে শুনেছে নিশ্চয়।

কিন্তু নির্মলা কোথায়? ঘরের বাহিরে যাবার দরজা খোলা। দোলনায় তার সকাল বেলার কিনে দেওয়া পুতুলটি শুধু পড়ে আছে। দোলনার কাছে গিয়ে পরিতোষ বেদনা-বিমূঢ় ভাবে গিয়ে দাঁড়ায়। পুতুলটি অন্যমনস্কভাবে হাতে তুলে নিতে চিঠিটা এবার সে দেখতে পায়। যন্ত্রচালিতের মত চিঠিটা খুলে সে পড়ে। একবার নয় বারকয়েক পড়ে তবে যেন চিঠির মর্ম সে বুঝতে পারে। নির্মলা লিখে গেছে,—

পূজনীয়েষু

খোকাকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। বিশ্বাস কর যে তোমার ওপর রাগ করে বা তোমার কথায় আঘাত পেয়ে নয়। শুধু আমার আর এখানে থাকা উচিত নয় বলেই যাচ্ছি। আমি এবার বুঝেছি যে, আমি সংসারের অভিশাপ। যেখানে থাকব শুধু সর্বনাশই ডেকে আনবো। বাপ-মার জীবন আমার জন্য বিষ হয়ে গেছে, তারপর তোমার মত দেবতাকেও আমি কোথায় নামিয়ে এনেছি! এর চেয়ে বড় দুঃখ আর আমার কিছু নেই। আর কিছু লিখতে পারছি না। তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমায় খোঁজবার চেষ্টা করো না। ইতি—

প্রণতা
নির্মলা

চিঠিটার মর্ম বুঝে আচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ পরিতোষ সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সারারাত পরিতোষ উদ্দেশ্যহীনভাবে নগরের পথে নির্মলাকে খুঁজে বেড়ায়। তারপর সকাল হতেই তাকে বিজয়ের বাড়ীতে দেখা যায়। তার ক্ষ্যাপার মত উস্কো খুস্কো চেহারা দেখেও অপ্রসন্নভাবে বিজয় বলে,—আবার তুমি এখানে?

পরিতোষ কাতরভাবে বলে,—তুমি তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তবু না এসে পারলাম না বিজয়। আমাদের ভয়ানক বিপদ। নির্মলা কাল রাত্রে বাড়ী থেকে চলে গেছে!

বিজয় বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে,—শুনে বিশেষ আশ্চর্য হলাম না। তা ছাড়া এ সংবাদ আমার শোনবার দরকার নেই।

এ অবজ্ঞা মাথা পেতে নিয়ে পরিতোষ ব্যাকুলভাবে বলে,—তুমি বুঝতে পারছ না বিজয়। তাকে এখুনি খুঁজে না পেলে কি সর্বনাশ হবে, এই কোলকাতা শহরে ওই ছেলেটি নিয়ে কি বিপদে সে পড়তে পারে! কিছু সে জানে না, কোন আশ্রয় তার নেই।

আশ্রয় না পেয়েই চলে যাবার মত নির্বোধ সে নয়—বিজয়ের গলায় নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, সে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে,—আর চলে যে যাবে সে ত জানা কথা। একদিন আমাকে ছেড়ে তোমার ওপর ভর করেছিল, আজ আবার তোমায় ছেড়ে আর কারুর ওপর ভর করেছে দেখগে যাও।

তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জান না বিজয়! নির্মলার ওপর চরম অবিচার তুমি করেছ। কিন্তু এখন এমন করে নির্মম হয়ো না। তোমার ছেলের খাতিরেও তাকে খুঁজে বার করতে আমায় সাহায্য কর!

না, কোন সাহায্য আমি করবো না,—তীব্র ঝাঁঝালো গলায় বিজয় চীৎকার করে ওঠে।—এবং তোমাকেও বলছি এর পর নির্মলার কথা নিয়ে আমার কাছে এলে তুমি অপমানিত হবে।

বিজয় তার দিকে না তাকিয়েই ভেতরে চলে যায়। বিমূঢ় অসহায়ভাবে পরিতোষ অবশেষে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু যত অপমানই ভাগ্যে থাক পরিতোষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। পরিতোষকে সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ জয় করে জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণের কাছে আবার যেতে হয়। কাতরভাবে সে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে,—আমার সম্বল কতটুকু। কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা? কিন্তু আপনি চেষ্টা করলে খুঁজে বার করতে পারেন এখনো,—এখনো তাদের বাঁচান যায়।

বীরেন্দ্রনায়ায়ণ কাছাড়ী ঘরে বসেই পরিতোষের কথা শুনছিলেন। অদূরে শশীভূষণ তার খাতাপত্রের মধ্যে নিমগ্ন। বীরেন্দ্রনারায়ণকে খানিক চুপ করে থাকতে দেখে যেটুকু আশা পরিতোষের হয়েছিল পর মুহূর্তে তাঁর রুক্ষস্বরে সে আশা তার চুরমার হয়ে যায়। চৌধুরী মশাই গম্ভীর ভাবে বলেন,—কিন্তু আমার তাদের খোঁজবার কোন দায় ত নেই।

পরিতোষ তবু বলে,—আপনি অন্তরে অন্তরে জানেন সত্যি দায় আছে কিনা। আর কেউ না বলুক আপনি মনের ভেতর জানেন যে, সে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। যে সন্তান নিয়ে সে আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথে বেরিয়েছে তাঁর মধ্যে যে আপনাদের বংশের রক্তই বইছে এ-কথা জেনেও এমন নিষ্ঠুর হবেন না। আপনার অভিমানে যদি কোন দিন ঘা লেগে থাকে তার শোধ কি এতদিনেও হয়নি? আপনার বংশধর ওই দুধের শিশুকে না মারলে কি তার তৃপ্তি হবে না।

বীরেন্দ্রনারায়ণ মাথা নীচু করে সমস্ত কথাই শোনেন।

পরিতোষের দীর্ঘ আবেদনের মাঝে কোন বাধা তিনি দেন না? কে জানে হয়ত হৃদয়ের কোন গভীর স্তরে গিয়ে পরিতোষের মিনতি তাঁকে আঘাত করেছে কি না।

শশীভূষণকে খাতাপত্র থেকে একবার মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতে দেখা যায়।

কিন্তু হঠাৎ বীরেন্দ্রনারায়ণ কি যেন রুদ্ধ আবেগ চাপতে না পেরে একেবারে ফেটে পড়েন,—এসব উপদেশ তোমার কাছে শুনতে প্রস্তুত নই। তোমার ধৃষ্টতা অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তুমি বেরিয়ে যাও!

পরিতোষ বুঝতে পারে আর কোন আশা নেই। ম্লানমুখে বলে,—দোহাই আপনার এখনও ভেবে দেখুন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ বজ্রগম্ভীরস্বরে হাঁকেন,—যাও।

অপমানে, বেদনায়, হতাশায়, পরিতোষের চোখে এবার সত্যি জল আসে। বিহ্বলভাবে খানিক তাকিয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

সমস্ত কাছারী ঘর কি একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে যেন স্তব্ধ।

সে স্তব্ধতা প্রথম ভাঙ্গে শশীভূষণের কথায়। হঠাৎ খাতাপত্র থেকে মুখ তুলে নেহাৎ যেন কথায় কথায় তিনি বলেন,—ছেলেটা শুনলাম দেখতে চমৎকার হ'য়েছিল!

তুমি চুপ করো শশীভূষণ!—চৌধুরী মশাই প্রায় গর্জন করে ওঠেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ত চুপ করেই আছি,—বলে শশীভূষণ

আবার খাতাপত্রে নিবিষ্ট হন। কিন্তু মুখ তাঁর বন্ধ হয় না। খানিক বাদেই বলেন,—কাঙ্গাল ভিখিরীদের অমন কত ছেলে পথে-ঘাটে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে তাতে কার কি ?

চৌধুরী মশাই কঠিনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন,—যার যেমন কাজ, তাকে তেমন শাস্তি পেতে হবে। আমাদের তা নিয়ে ভাবনা করবার কিছু নেই !

কিছু না, কিছু না, কোথাকার কে তার জন্য আবার ভাবনা ! শশীভূষণের গলায় ঠিক ঔদাসিন্য কিন্তু ফুটে উঠে না—এতদিনে হয়ত সাবাড়ই হয়ে গেছে। আর জন্মে কর্মদোষ ছিল নিশ্চয়, এজন্মে তাই শাস্তি।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আর যেন সহ্য করতে পারেন না। ঘর থেকে সবেগে তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে তিনি ফিরে দাঁড়ান। তারপর নেহাৎ যেন তাচ্ছিল্যভাবে বলবার চেষ্টা করেন—তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি কোলকাতায় খোঁজ করতে পার।

শশীভূষণ উত্তর দেন না। খাতায় কি একটা লেখা তিনি সযত্নে কাটছেন দেখা যায়। সেখানে লেখা আছে।—

মা আমায় ঘুরাবি কত / চোখ বাঁধা বলদের মত।

জমিদার মশাই ইতিমধ্যে আবার তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছেন। শশীভূষণ যেন লজ্জিত হয়ে খাতাটা মুড়ে ফেলেন। চৌধুরী মশাই বলেন তুমি আজই রওনা হতে পার।

আজ্ঞে হ্যাঁ তাই ভাবছি, -জমিদার ফিরে চলে যেতেই শশীভূষণের মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা যায়।

শশীভূষণ কোলকাতায় এসে নির্মলাকে খোঁজবার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন না। থানায় থানায় খবর দিয়ে খোঁজ নেন, নিজেদের লোক সর্বত্র লাগিয়ে যে ভাবে তিনি নির্মলার জন্য ব্যাকুলভাবে শহর চষে বেড়ান তাতে সত্যি একটু অবাকই হতে হয়। জমিদারের চেয়ে তার যেন বেশী দায় এখন নির্মলাকে খোঁজবার।

কিন্তু এত করেও নির্মলার কোন খোঁজ মেলে না। শশীভূষণ

ক্রমশ হতাশ হয়ে ওঠেন। নির্মলা কি তাহ'লে কোলকাতাতেই নেই? ওই একটি দুধের শিশুকে নিয়ে এই মহানগরীতে সে কি সত্যিই চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?

নির্মলা কিন্তু কোলকাতার বাহিরে কোথাও যায়নি। অনেক দুর্যোগের পর রাঁধুনীরূপে একটি গৃহস্থ বাড়ীতে সে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি এতটা সুপ্রসন্ন বেশি-দিন থাকে না। সেদিন সকালে সে রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল। তার ছেলেটিকে একটি ভাঙা খেলনা দিয়ে কাছেই রেখেছিল বসিয়ে। হঠাৎ ছেলেটি ডুকরে হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদে ওঠে। নির্মলা ফিরে দেখে মনিবের দুরন্ত ছেলেটি কখন এসে তার খেলনাটি কেড়ে নিয়েছে।

নির্মলা উঠে এসে মিষ্টি করে বলে,—ওটা দিয়ে দাও মনু দেখছ না কেমন কাঁদছে।

কাঁদছে ত বয়ে গেল।—মনিবের আদরের ছেলে মনু যেমন অসভ্য তেমনি স্বার্থপর।

ওটা ত তোমার নয়, কেন তুমি নিচ্ছ?—আবার শান্তস্বরে বলে নির্মলা।

বেশ করেছি নিয়েছি এটাত আমি কাল কিনেছি!—মনু অম্লান বদনে বলে।

ছি মিথ্যে কথা বলতে নেই—নির্মলা মৃদু একটু শাসন করে।

আদুরে গোপাল মনু চীৎকার করে ওঠে,—আমি মিথ্যেবাদী? তুই, তুই মিথ্যেবাদী!

দূর থেকে মনুর চীৎকারে তার মা এবার এসে উপস্থিত হন—কি হয়েছে কি, এত গণ্ডগোল কিসের?

মনু একেবারে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠে বলে,—দেখ না মা, বামুন ঠাকরুণ আমায় যা তা বলে গাল দিচ্ছে।

মনুর মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন,—তুমি ত বেশ লোক বাছা, আমারি খেয়ে পরে আমার ছেলেকে গালমন্দ! এত বড় তোমার আস্পর্ধা।

নির্মলা সমস্ত ব্যাপার দেখে হতভম্ব। শান্তস্বরে তবু সে বলে,—গালমন্দ দিই নি, মিথ্যে কথা বলছিল তাই বলেছি।

কি—ছোট মুখে বড় কথা !—মনুর মা গর্জন করে ওঠেন।—আমার ছেলে মিথ্যেবাদী ! পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছিলে, দয়া করে ঘরে এনে ঠাঁই দিয়েছি, আবার মুখের ওপরই চোট ! বেরিয়ে যাও ! বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

এত বড় অপমানেও নির্মলা রেগে ওঠে না। রাগ করবার তার অধিকার কোথায় ? খানিক বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থেকে শান্ত ভাবে বলে,—কেন মিছে রাগ করছেন, আমার আশ্রয় নেই বলেই ত বার বার আমায় তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখান !

ইস্ ! আশ্রয় ত নেই কিন্তু তেজ ত আছে ষোল আনা।—মনুর মা খেঁকিয়ে ওঠেন !—না বাপু, তোমার মতন রাঁধুনী আমার দরকার নেই ; কোনদিন কি রান্নায় মিশিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে মার আর কি ? তুমি এখুনি বেরোও, এখুনি বেরোও, এখুনি এই কাপড়ে বেরোও বলছি।

এরপর আর কোন মতেই বুঝি থাকা চলে না। ম্লান অশ্রুসজল মুখে রোরুদ্যমান ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁথাটি জড়িয়ে নির্মলা ধীরে ধীরে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর পথে পথে একটি অসহায় নিঃসম্বল সন্তানের জননীর দিন যে কি ভাবে কাটে তার বর্ণনাও বুঝি দুঃসহ। দুর্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত হয়ে সন্তানকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা মাত্র যখন তার সম্বল হয়েছে, তখন পথের ধারের একটি গ্যাসের তলায় তার দেখা পাওয়া যায়। শিশুটিকে বুকে করে পথচারীর দয়ার ওপর নির্ভর করে সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আকাশে ঘন ঘটা। ঝিরঝির করে বৃষ্টির আর বিরাম নাই। ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাঝে মাঝে এক একবার প্রবল হয়ে উঠছে। ছেলেটিকে কোনমতে বৃষ্টি থেকে ছেঁড়া কাঁথা ঢাকা দিয়ে বাঁচিয়ে তবু নির্মলাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। ভিক্ষাটা এখনও বুঝি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় নি ! কেউ কিছু দিতে এলেও লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে হাত বাড়াতে বাধা দেয়।

পাশেই একটি সাধারণ চায়ের দোকান। সেখান থেকে বেরিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে একটি লোক নির্মলার কাছ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। নির্মলা একবার তার মুখের দিকে চেয়ে

সংকুচিতভাবে আরো অন্ধকারের দিকে সরে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটি তবু ছাড়ে না। আরো কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে,—আরে কে, আমাদের নির্মলা না? নির্মলার কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই উল্লসিত কণ্ঠে বলে,—ঠিক চিনেছি বাবা! আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে এমন মেয়ে-ছেলে ত দেখলাম না; তা বাবা জড়োয়া, বেনারসীই পর আর ছেঁড়া কাঁথাতেই ঢাকো—একবার দেখেছি ত ব্যস ছাপা হয়ে গেছে। নির্মলা তবু নীরব। লোকটিকে সে অবশ্য চিনতে পেরেছে। যে বাড়ীতে পরিতোষ ও সে প্রথম কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল, লোকটি তার বাড়ীওয়ালা। রাখালরাজ চক্রবর্তী।

রাখালরাজ একটু চুপ করে থেকে হেসে বলে,—তারপর পথে এসে দাঁড়িয়েছ তাহ'লে? পথে ভাসিয়ে দিয়ে সে বেটা সট্‌কান, কেমন? সে আগেই জানতাম,—সব ব্যাটাই দেয়। সবাই ত আর রাখালরাজ চক্কোত্তি নয়! একবার পা ফস্কে ছিল, ব্যস সেই থেকে রাজরাণী করে রেখেছি দেখগে যাও। তা বলি, থাকা হয় কোথায়? ঘরটর নিয়েছ নাকি? নিতেই হবে বাপু। না নিয়ে থাক, চল বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি! খাসা বন্দোবস্ত! খাট-পালঙ্, বার্ণিস করা, সিসে-বসান আলমারী, সব একেবারে মজুত। খালি মাসে মাসে কিস্তির টাকাটা গুনে গেলেই হল। তা তুমি পারবে··· বেটা এখনও সব ফতুর করে যেতে পারে নি, রূপ যৌবন কি বলে···

রাখালরাজ সোৎসাহে কতক্ষণ বকে যেত কে জানে? কিন্তু নির্মলা এবার অস্ফুট কাতর কণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে,—আমার ছেলের দুদিন ধরে জ্বর, দুদিন ধরে কিছু খায়নি।

রাখালরাজের চেহারা তৎক্ষণাৎ বদলে যায়,—অ্যাঁ, ছেলের জ্বর! রামঃ রামঃ! এই ত সব মাটি করে দিলে দেখছি? ওই ছেলে-পুলে শুনলেই যে মনটা অন্য রকম হয়ে যায়! দেখ দিকি কোথা থেকে একটা ল্যাঠা বাধিয়ে বসলে? তা ছেলের জ্বর ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন?

রাখালরাজ রীতিমত বিরক্ত হয়ে ওঠে। নির্মলার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে নিজের মনে আবার বলে,—বুঝেছি, দাঁড়াবার জায়গা আর নেই। ভালো ফ্যাসাদ বাধল ত' এই সন্ধ্যাবেলায়!

তোমায় দেখে এখন চলেই বা যাই কি করে ? ভদ্দরলোকের ছেলে হ'লে না হয় দুটো পয়সা দিয়েই সরে পড়তাম। আমাদের শালার যত মরণ, তোমায় ফেলেও যেতে পারি না।

রাখালরাজের অস্থিরতাটা সত্যি উপভোগ্য। একটু ইতস্তত করে সে আবার বলে,—চলো, নেহাৎ আমার গেরো, নিয়ে যেতেই হবে। সে খাণ্ডার মাগী আবার দুশো কথা শোনাবে'খন। তা শোনালে আর কি করছি বল। ছেলের জ্বর ! দেখ দিকি—নাও এস।

ছাতাটি সযত্নে নির্মলার মাথায় ধরে রাখালরাজ এবার অগ্রসর হয়। নির্মলাকেও সঙ্গে যেতে হয়।

এটুকু অনুগ্রহে আপত্তি জানাবার মত অবস্থা তার এখন নয়। রাখালরাজ যেতে যেতে অভ্যাস মত বকতে সুরু করে,—ছেলের জ্বর তা আমাদের ওখানে দুদিন আগে যাও নি কেন ? গেলে কি তোমায় কেউ ঝাঁটা মেরে বিদায় করতো ! বলিহারী বুদ্ধি বটে ! তা' না হ'লে আর বলে মেয়েমানুষ !

নির্মলাকে সঙ্গে নিয়ে, বাড়ীর বাইরে পেঁছে কিন্তু রাখালরাজ একবার থামে, তারপর একটু যেন ইতস্তত করে বলে,—এখানে একটু দাঁড়াও বাপু, আমি আগে একটু হাওয়া বুঝে আসি। বলা ত যায় না, এখন ডাকিনী না যোগিনী, না মোহিনী কোন মূর্তিতে আছেন।

নির্মলাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে রাখালরাজ বেশ একটু সভয়েই নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। তারপর একগাল হেসে দুবার মাথা চুলকে বলে,—কাপড় গুছোচ্ছিস বুঝি ?

যাকে উদ্দেশ্য করে মোলায়েম কণ্ঠে এ প্রশ্ন করা হয় রাখাল-রাজের সেই পরিবার কাংশকণ্ঠে খেঁকিয়ে ওঠেন,—কেন দেখতে পাচ্ছ না ? চোখের মাথা খেয়েছ ?

ওই ত তোর দোষ। একটা ভাল করে কথা বলতে গেলাম !—রাখালরাজ যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু অপর পক্ষের তাতে কিছু মাত্র নরম হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। আর ভাল কথায় কাজ নেই। আমার বলে মাথার

ঘায়ে কুকুর পাগল,—সংসার নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, উনি ভাল কথা শোনাতে এলেন।

রাখালরাজ হাওয়া বুঝে অত্যন্ত সহানুভূতির সুরে বলে,—সত্যি তোর বড্ড খাটুনি।

আর সোহাগে কাজ নেই! কি রাজ-ঐশ্বর্য দিয়ে রেখেছ? খাটুনি নিয়ে আবার আফশোষ।—মুখ নাড়া দিয়ে বাড়ির গিন্নী বাইরে যাবার উপক্রম করেন।

আহা, রাগ করিস কেন? রাখালরাজ ব্যস্ত হয়ে ওঠে,—ভাবছিলাম তোর একটা সঙ্গের লোক-টোক থাকত, একটু কাজের সুসার হত, দুদণ্ড গল্প-টল্প করতিস···

রাখালরাজের কথাটা আর শেষ করতে হয় না। আগুনে যেন ঘি পড়ে।—বলি মতলবটা কি বল ত? বুড়ো বয়সে পালক গজিয়েছে—বুঝি? গিন্নী মারমুখী হয়ে ওঠেন।

রাখালরাজ সভয়ে দু'পা পিছিয়ে বলে,—আরে, রামঃ রামঃ! কি যে বলিস তুই, আমি মানে—আমাদের সেই ভাড়াটে মেয়েটা ছিল না,—বড় দুঃখে পড়েছে। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল···

ও হতচ্ছাড়া, তুমি তাকে ফুসলে এনে এইখানেই রাখতে চাও? আমারি বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়ান?—গিন্নী এবার সত্যি গলার চোটে পাড়া মাথায় করে বলেন—আন না একবার দেখি, মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে বিদেয় করব। আমার নাম বিদ্যেধরী···

রাখালরাজ শশব্যস্ত হয়ে বলে,—আহা করিস কি! শুনতে পাবে। এই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

কি? একেবারে বাড়ীতে এনে তুলেছ বুঝি! দাঁড়াও—বলে বিদ্যেধরী রণ-রঙ্গিনী মূর্তিতে ঘর থেকে বার হয়। রাখালরাজ সভয়ে পিছু পিছু তাকে সামলাবার চেষ্টায় যেতে যেতে বলে,—আরে শোন্···

কিন্তু কে কার কথা শোনে। একেবারে বাঘিনীর মত বিদ্যেধরী গিয়ে নির্মলার সামনে দাঁড়ায়। রাখালরাজ ব্যাকুলভাবে জানায়,—শোন শোন, ওর ছেলের জ্বর, কদিন ধরে খেতে পায় নি।

বিদ্যেধরী একবার রাখালরাজ একবার নির্মলার মুখের দিকে

বারকয়েক অগ্নি দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর তেমন ঝাঁঝাল গলায় বলে,—হ্যাঁগা ভালো মানুষের মেয়ে। ছেলে নিয়ে ত পথে ভেসেছ বুঝেছি, কিন্তু গলায় ফাঁস দেবার আর কি মানুষ ছিল না শহরে? আমার সর্বনাশ করতে এই উজবুকটিকে ধরেছ কেন?

নির্মলার সকাতর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে,—না, না,—আমি যাচ্ছি, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইনি।

না ক্ষতি করতে চাও না! রোগা ছেলে নিয়ে ঘরের দরজা থেকে শুকনো মুখে ফিরে যাও, আর আমাদের শাপ-মন্যি লাগুক আর কি।

নির্মলা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিদ্যেধরী আবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে,—ঢঙ করে আর দাঁড়িয়ে কেন? দয়া করে এসে বাড়ীতে ঢোক, কিতাথ হই। ভাল আপদ হয়েছে!

মুখখানা বিরক্তিতে বিকৃত হলেও দেখা যায় ছেলেটিকে সে নিজেই কোলে তুলে নিয়েছে। তারপর আর একবার খেঁকিয়ে উঠে সে বলে,—একেবারে সাবাড় করে এনেছ দেখছি! গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে যে।

নির্মলাকে ছেড়ে এবার স্বামীর দিকে বিদ্যেধরী মনোযোগ দেয়,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন? দুধ-টুদ আনতে হবে না, রোগা ছেলে খাবে কি?

হ্যাঁ, এই যে যাই,—বলে থতমত খেয়ে রাখালরাজ বেরিয়ে যায়।

হেঁচকি দিয়ে নির্মলার হাতটা টেনে বিদ্যেধরী যেন জেলের কয়েদীর মত তাকে ধরে নিয়ে যায় ভেতরে।

নির্মলা আবার আশ্রয় পায়।

কয়েকমাস কেটে গেছে। শশীভূষণ এখনও নির্মলার বা তার ছেলের কোন সন্ধান পান নি। তবু তিনি হাল ছেড়ে দেন নি। তাঁর কেমন একটা অটল প্রতিজ্ঞা যে নির্মলাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

অনেক দিন পরে একদিন থানা থেকে প্রথম যেন আশা পাওয়া যায়।

থানার ইনস্পেক্টার বলেন,—দেখুন, এবারেও ঠিক করে বলতে পারছি না, তবে আমার মনে হয় এই ঠিকানাতে একবার খোঁজ করে দেখতে পারেন।

আচ্ছা, তাই দেখি একবার! বলে ঠিকানা নিয়ে শশীভূষণ বিদায় নেন।

ইনস্পেক্টার হেসে বলেন,—কি মশাই, একটা ধন্যবাদ দিয়েও গেলেন না?

ধন্যবাদটা খুঁজে পাবার পর দেব'খন।—বলে, শশীভূষণ আর অপেক্ষা করেন না। সোজা গ্রামেই রওনা হন।

নির্মলা এখনও সেই আশ্রয়েই আছে, কিন্তু তার ছেলেটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সে জ্বর আর তার সারে নি। ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে সে এখন প্রায় বিছানায় মিশে গেছে বল্লেই হয়।

নির্মলা সেদিন রুগ্ন ছেলের বিছানার পাশেই আচ্ছন্নের মত বসে ছিল। অভাব, দুঃখ, দুর্ভাবনা, হতাশা সমস্ত মিলে তার মুখে এমন একটা ছাপ ইতিমধ্যে এঁকে দিয়েছে যে তাকে চেনাই যায় না। তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন পৃথিবীতে কোথাও আর আলো তার জন্যে নেই। বিদ্যেধরী পাশের ঘর থেকে এসে নির্মলাকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে শাসন করে উঠল, চুপ করে বসে আছ যে বড়। ক'টা বাজে খেয়াল আছে! ওষুধ দেবার সময়টাও আমি বলে দেব? শুধু বসে ভাবলেই ত ছেলের রোগ সারবে না?

ক্লান্ত কণ্ঠে নির্মলা বললে,—আর সারবে বলে ত আশা হচ্ছে না দিদি?

শোন কথা! অসুখ আর কারুর ছেলের হয় না যেন কোন-দিন। বিদ্যেধরী যেন জ্বলে উঠল!—তুমি উঠে একটু অন্য কাজে যাও দেখি! আমি একটু বসি। সারাদিন গুমরে গুমরে নিজেও যে সাবাড় হবার যোগাড় করেছ।

নির্মলা উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ বাইরে থেকে রাখালরাজের গলা শোনা গেল। রাখালরাজ কাকে যেন বলছে,—আসুন, আসুন, এই বাড়ী বই কি। আলবৎ এই বাড়ী। রাখালরাজ চক্কোত্তি বল্লে এ তল্লাটে কোন্ বেটা না চিনবে!

নির্মলা ও বিদ্যেধরী দুজনে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল। রাখালরাজ সর্বপ্রথম ঘরে ঢুকে একগাল হেসে বাহাদুরীর স্বরে বললে,—হুঁ, আগেই জানতাম এ যে সে ঘরের মেয়ে নয়! ও যতই ছাই চাপা দাও, আগুন কি আর চাপা থাকে? তা ছাড়া রাখালরাজের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

বিদ্যেধরী খেঁকিয়ে উঠল, কি বকছ কি?—

কিন্তু রাখালরাজের আজ বুঝি একটা মস্ত কীর্তির দিন। এই সর্বপ্রথম বোধ হয় পরিবারের ভ্রূকুটীকে উপেক্ষা করে সোৎসাহে সামনের দরজার দিকে ফিরে সে বললে,—এই যে আসুন না, আসুন এই ঘরে। এখানে লজ্জা করবার কেউ নেই।

বিদ্যেধরীকে একবার দেখিয়ে দিয়ে সে আবার বললে,—আমার ইস্তিরী। ও সকলের সামনে বেরোয়!

ঘরে অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেখে বিদ্যেধরী রাখালকে একবার রক্ত চক্ষু দেখিয়ে ঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়াল। নির্মলা কিন্তু কঠিন হয়ে যেখানে ছিল সেইখানেই রইল দাঁড়িয়ে। ঘরে যাঁরা ঢুকেছেন তাঁদের সে চেনে। তাঁদের একজন জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বয়ং আর একজন শশীভূষণ। সঙ্গে করে গ্রামের ডাক্তারকেও তাঁরা নিয়ে এসেছেন। আর এনেছেন, ফলের একটি ঝুড়ি। সেটি বিছানার কাছে এনে শশীভূষণ নামিয়ে রাখতেই রাখালরাজ একগাল হেসে বললে,—কেমন, ঠিক মিলেছে ত! মিলতেই হবে, আমি সেই গোড়া থেকেই জানি ···দুখিনি সীতার উদ্ধার কি না হয়ে পারে? কিন্তু রাখালরাজ অযত্ন করেছে সে কথাটি কেউ বলতে পারবে না···

বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরের সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিছানায় শোয়ান রুগ্ন শিশুটিকেই বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এবার রাখালরাজকে বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবে নির্মলার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—কতদিন অসুখ হয়েছে?

রাখালরাজই ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলে,—আজ্ঞে তা কম দিন নয়, দেখতে দেখতে এই ক'মাস হয়ে গেল। তাও ভাগ্যে রাখালরাজ রাস্তা থেকে দেখে আদর করে ঘরে এনে···

বিদ্যেধরীর চোখের শাসনেই রাখালরাজ কথাটা মাঝ পথে

শেষ করলে। চৌধুরী মশাই নির্মলার দিকে ফিরে তাকে উদ্দেশ্য করেই আবার বল্লেন,—অনেক খোঁজ করে আমায় এখানে আসতে হয়েছে। তোমায় গোটাকতক কথা বলতে চাই।

নির্মলা পাথরের মূর্তির মত নিথর নিস্তব্ধ। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বার হ'ল না।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার বল্লেন,—এ ছেলের যা অবস্থা হয়েছে দেখছি উপযুক্ত চিকিৎসা করেও একে বাঁচান বোধ হয় কঠিন। কিন্তু তবু যদি বাঁচে তাহ'লে একে এই দারিদ্রের মধ্যে মানুষ করে তুলতে তুমি ত পারবে না।

বীরেন্দ্রনারায়ণ নির্মলার কাছে একটা উত্তরের আশাতেই বোধ হয় চুপ করলেন। কিন্তু নির্মলা তবু নীরব। তার চোখের দৃষ্টিতে শুধু কি যেন একটা দুর্জ্ঞেয় দীপ্তি।

আমি একে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।—বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বরে এবার সত্যকার ব্যাকুলতা ফুটে উঠল,—ওর চিকিৎসার কোন ত্রুটি আমি রাখব না। যদি আমাদের ভাগ্যে ও বাঁচে তা'হলে ওকে মানুষ করবার জন্য যা প্রয়োজন সবই আমি করব। কোন অভাব ও কোনদিন জানতে পারবে না।

রুগ্ন শিশুটি এতক্ষণ ধরে লোলুপভাবে ফলের ঝুড়িটির দিকে চেয়েছিল। বীরেন্দ্রনারায়ণের কথার মাঝখানেই সে ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে বায়না করে উঠল,—আমি ঐ একটা নেব।

শশীভূষণ তাড়াতাড়ি দুটি ফল তুলে বীরেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। বীরেন্দ্রনারায়ণ সস্নেহে সে দুটি ছেলেটির হাতে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হিংস্র বাঘিনীর মত সে ফল তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্মলা মূর্তিমতী প্রলয়ের মত তাঁদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তীব্র বিদ্বেষের স্বরে বললে,—আমার ছেলেকে আপনি নিয়ে যেতে এসেছেন? তাকে চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে তুলবেন? তাকে মানুষ করবেন? কেন আপনার এত অনুগ্রহ বলুন ত?

ছেলেটি তখন ফল না পেয়ে কাতরভাবে কেঁদে উঠেছে। সে দিকে একবার চেয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ বল্লেন—আমায় ভুল বুঝ না··· আমি তোমার ভালর জন্যই—

কিন্তু নির্মলার স্বর আরো হিংস্র হয়ে উঠল,—হ্যাঁ, এই ছেলের ভালর জন্যই আপনার দুর্ভাবনার সীমা নেই। আপনি জানেন ওর দেহে আপনাদেরই বংশের রক্ত, ও আপনাদের নিজের। তাই ওকে বাঁচাতে হবে, মানুষ করতে হবে। আর আমি শুধু উনুনের পোড়া ছাই। পুড়ে খাক হয়ে যা কাজে লাগবার লেগেছি। এখন আঁস্তাকুড়েই তাই আমার জায়গা। কিন্তু যা আশা করেছেন তা হবে না।

কিন্তু তা না হলে ও ছেলে বাঁচবে না!—বীরেন্দ্রনারায়ণের এমন দুর্বল কাতর কণ্ঠস্বর কেউ বুঝি কখনও শোনেনি।

বাঁচবার দরকার নেই! নির্মলা যেন সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে,—ও মরবে আমি জানি, আর তাই আমি চাই। হ্যাঁ তাই আমি চাই। ওকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না, এ আপনার জমিদারী নয়। ও এইখানে তিলে তিলে মরবে। আর আপনি জানবেন আপনার বংশধর না খেতে পেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্চে। যান্ যান্ এখান থেকে।

রুগ্ন শিশু তখনও কাঁদছে—আমায় ওই দিলে না কেন? আমায় ওই দাও।

না!—বলে চীৎকার করে সমস্ত ফলের ঝুড়িটা দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্মলা উন্মত্তভাবে বললে, যান নিয়ে যান আপনাদের জিনিষ। আমার ছেলের মুখে এর বদলে বরং বিষ তুলে দেব, তবুও এ জিনিষ তাকে ছুঁতে দেব না।

নির্মলার সে মূর্তির সামনে বীরেন্দ্রনারায়ণও এক মুহূর্তে যেন কেমন অসহায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলেন। শীর্ণ ছেলেটি দুর্বলভাবে তখনও ডুকরে কাঁদছে। একবার সেদিকে একবার নির্মলার দিকে চেয়ে কম্পিত পদে তিনি যেন বজ্রাহতের মত অচেতন ভাবে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। শশীভূষণ ও ডাক্তারকেও তাঁর পিছু পিছু ঘর থেকে যেতে হল।

নির্মলা আবার যেন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার কাছে এসে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বিদ্যাধরী বললে,—কি করলে নির্মলা?

হঠাৎ যেন নির্মলার চেতনা ফিরে এল, আর্তনাদের মত তার

কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল,—কি করলাম আমি! আমি কি করলাম দিদি? মা হয়ে আমি ছেলের মরণ কামনা করলাম, তাকে অভিশাপ দিলাম।

বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ছেলেটিকে বুকের ভেতর প্রাণপণে চেপে ধরে সে কেঁদে উঠল! এ যে আমার মনের কথা নয় ঠাকুর। এ যে আমার মনের কথা নয়।

বস্তি থেকে বার হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বীরেন্দ্রনারায়ণ বড় রাস্তায় তাঁর গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। শশীভূষণ তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে, দেখে বল্লেন,—তুমি এস শশীভূষণ।

শশীভূষণ তার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে চেয়ে বল্লেন,—না, আমি আর যাব না?

তুমি কি তাহ'লে পরে আসবে?—ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরী মশাই।

আমি একেবারে ছুটী নিচ্ছি চৌধুরী মশাই।—বলে, শশীভূষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ বিমূঢ় ভাবে শশীভূষণের দিকে চেয়ে রইলেন। শশীভূষণের কথার মর্ম সত্যিই বোঝা যায় না।

শশীভূষণ একটু চুপ করে থেকে একটু যেন আবেগের সঙ্গেই এবার বললেন,—হ্যাঁ চৌধুরীমশাই অনেককাল আপনার নুন খেলাম, নেমকহারামিও কখন করি নি। ভাল, মন্দ, ন্যায়-অন্যায় আপনার যাতে ভালো হবে মনে করেছি অম্লান বদনে তা করেছি। কিন্তু আর ভালো লাগছে না। কোথা থেকে অনেক যেন ময়লা জমে গেছে মনে। ভাবছি প্রয়াগে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াব। একটা পেট ঠিক চলে যাবে।

বীরেন্দ্রনারায়ণ তবু বিমূঢ় ভাবে বললেন,—তুমি যদি তীর্থ ভ্রমণ করতে চাও···

না, তীর্থে টীর্থে আমার বিশ্বাস নেই। আমি এমনি বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াব।—বলে শশীভূষণ ম্লানভাবে একটু হাসলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ খানিকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না,

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন,—তুমিও আমায় ছেড়ে যাচ্ছ শশী। আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, —আমিও যদি সব ছেড়ে যেতে পারতাম।

শশীভূষণ একটু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবার, না না, আপনি কোথায় যাবেন? গ্রামে কাল আপনার নাতির অন্নপ্রাশন। আপনি সেখানে না থাকলে চলে?

বীরেন্দ্রনারায়ণ পৌত্রের অন্নপ্রাশনের উল্লেখে মনে হল একবার যেন কেঁপে উঠলেন, তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ, আমায় যেতেই হবে।

শশীভূষণ ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে আদেশ দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে গাড়ি দূরের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও খানিকক্ষণ তাঁকে সেইখানেই অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে নগরের জনতার মাঝে কখন তিনি মিশে গেলেন কে জানে!

বিজয় ও অনিমার প্রথম সন্তান, জমিদারের প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। জমিদার বাড়িতে বিরাট উৎসব। উমানাথই পুরোহিত রূপে সমস্ত অনুষ্ঠান সমাধা করতে বসেছেন। গ্রামশুদ্ধ নিমন্ত্রিত হতে কারুর বাকী নেই। বহুদিন বাদে মাধবীও বাপের বাড়ী এসেছে। তাকে অনুষ্ঠানের আগেই এক কোণে সোৎসাহে শাঁখ বাজাতে দেখে অনিমা হেসে বললে,—তুমি যে আগে থাকতেই শাঁখ বাজাতে শুরু করলে ঠাকুরঝি এখনও যে দেরী আছে।

মাধবী চিরদিনের মতই এখনও হাসিখুশি আমুদে। হেসে বললে,—যা পারি বাজিয়ে নিই বৌদি! ভাইপোর বিয়ে অবধি হয় ত বাঁচব না, ভাতেই তাই সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি।

বাবা, তোমার আশা ত কম নয়! অনিমা স্নিগ্ধ হেসে বললে,—এরই মধ্যে ভাইপোর বিয়ের কথা ভেবে ফেলেছ! তা আশা যখন করেছ তখন বিয়ে না দেখে যাচ্ছ কোথায়?

না বৌদি, আশা করলেই কি হয়! মাধবীর গলার স্বর একটু ভারী হয়ে এল।—মার কতই ত আশা ছিল কিন্তু তিনি আর দেখে যেতে পারলেন কই?

অন্নপূর্ণা কিছুদিন হ'ল অনিমার বিবাহের পরই এ-সংসার থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছেন।

তাঁর কথা মনে করে দুজনে খানিক নিস্তব্ধ হয়ে রইল। অনিমাই প্রথম ব্যথিত স্বরে বললে,—এই আনন্দের দিনে আর একজনের কথাও মনে হচ্ছে ঠাকুরঝি!

মাধবী তার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে হাসি দিয়ে সমস্ত ব্যাপার হালকা করার চেষ্টায় বললে,—আচ্ছা খুব হয়েছে! সতীন না হ'লে আর সুখ হচ্ছে না বুঝি? দাদার কাছে কোন-দিন বলে ফেলনি ত?

না, তুমি যখন বারন করেছ!—মৃদুকণ্ঠে বললে অনিমা।

খুব লক্ষ্মী মেয়ে!—বলে হেসে তাকে আদর করে মাধবী বললে—এখন ওদিকে যাও দেখি, দাদা হাঁ করে বৎসহারা গাভীর মত তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিলেক অদর্শনেই অন্ধকার।

মাধবী হেসে চলে যাবার পর অনিমা নিজের ঘরে যাবার পথেই স্বামীর দেখা পেয়ে পেছন থেকে হেসে বললে,—কিগো কাকে খুঁজছ এমন আকুল হয়ে?

এই যে তোমাকেই খুঁজছি।—বলে বিজয় ফিরে তাকালে।

অনিমা স্নিগ্ধ হেসে বললে,—তাই ভাল, কিন্তু একটু সাবধান হতে হয়। ঠাকুরঝি ঠাট্টা করছিল যে।

কি ঠাট্টা করছিল?

বলছিল তোমার নাকি তিলেক অদর্শনেই অন্ধকার!—বলে অনিমা হাসল।

বিজয়ও হেসে বললে,—নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। অবস্থাটা প্রায় তদ্রূপ, কিন্তু শোন, বড় ভাবনায় পড়েছি। বাবা এখনও এলেন না কেন বুঝতে পারছি না, সকালের গাড়ীতে আসবার কথা।

তা'হলে এই গাড়ীতেই আসবেন।—বিজয়কে আশ্বাস দিয়ে অনিমা বললে—নিশ্চয় কোন দরকার পড়েছে সেখানে। নইলে তিনি কখন দেরী করতে পারেন আজকের দিনে?

হঠাৎ দুজনের কথার মাঝখানে শাঁখ হাতে ঘরে ঢুকল মাধবী। বকুনি দিয়ে বললে,—বাঃ তোমরা ত বেশ? গল্প করবার আর সময় পেলে না! পুরুত মশাই বসে আছেন। সময় হতে চললো। তোমরা যাও।

এই যে আমি যাচ্ছি।—বিজয়, যেন অপ্রস্তুত,—কিন্তু বাবা ত এলেন না।

বাবা এই এলেন। আমি তাঁকে খবর দিতে যাচ্ছি। তোমরা আগে ছেলে নিয়ে যাও দেখি ওখানে। খোকা কোথায়?

ঝি যে তাকে বাইরে নিয়ে গেল—বললে অনিমা।

দেখদেখি ঝি-র আক্কেল! মাধবী বিরক্ত হয়ে উঠল—এখন কি বাইরে বেড়াতে যাবার সময়। যাও তাকে ডাকিয়ে নাও। আমি যাচ্ছি বাবার কাছে।

মাধবী বাবার ঘরে ঢুকেই একটু বিস্মিত হয়ে গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরের এক ধারে মাথা নীচু করে বসে আছেন। তাঁর বসার ভঙ্গিটাই কেমন যেন অদ্ভুত। মনে হয় হঠাৎ কি যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন।

মাধবী উৎকণ্ঠিতভাবে ডাকলো,—বাবা!

মনে হ'ল বীরেন্দ্রনারায়ণ যেন শুনতে পান নি। কাছে এসে তাঁর মুখের চেহারা দেখে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে মাধবী জিজ্ঞেস করলে,- কি হয়েছে বাবা? তোমার শরীর খারাপ?

বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখ তুলে মাধবীর দিকে তাকালেন। ম্লান কণ্ঠে বললেন,—শরীর? না, শরীর ত ভালই আছে।

বাবার এমন কণ্ঠস্বর মাধবী আগে শোনে নি। অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেও আসন্ন অনুষ্ঠানের কথা ভেবে সে বললে,—ওদিকে যে সময় হয়ে গেছে। তোমার জন্যই সবাই অপেক্ষা করে আছে। তুমি চল।

আমি···আমি যাব? বীরেন্দ্রনারায়ণ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। একটু চুপ করে থেকে ধরা গলায় বললে,—আমি না গেলে হয় না?

কি বলছ বাবা? মাধবী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল,—খোকার ভাত, তুমি থাকবে না, তা কি হয়?

খোকার ভাত ! না, আমার নিশ্চিত যাওয়া দরকার। বীরেন্দ্র-নারায়ণ জোর করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও যেন পারলেন না। আবার বসে পড়ে হঠাৎ শঙ্কাতুর কণ্ঠে বললেন,—কিন্তু আমার যে কেমন ভয় হচ্ছে মাধবী !

সেকি কথা বাবা ? কি বলছ তুমি ? মাধবী এবার অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার তার দিকে খানিক উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন,—তুই···তুই বুঝতে পারবি না মাধবী। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন কোন অমঙ্গল···যেন···

তিনি কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। মাধবী কিছু ভালো করে বুঝতে না পারলেও এ অবস্থায় শক্ত হওয়াই উচিত বুঝে বললে,—ছিঃ বাবা ! এসব কথা বলতে আছে। তুমি ত এমন নও।

বীরেন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর জোর করে যেন শক্তি সংগ্রহ করে বললেন,—না, আমি এমন নই, আমি চিরকাল শক্ত, কঠিন। কিছুতেই আমি ভেঙ্গে পড়িনি। চ, চ আমি যাচ্ছি।

বীরেন্দ্রনারায়ণ কম্পিত পদে নিজেই এগিয়ে এলেন। ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে দুর্ভাবনায় মাধবীর চোখে তখন জল এসেছে। আঁচলে চোখের জল মুছে সে বাবাকে অনুসরণ করলে।

অনুষ্ঠানের জায়গায় ওদিকে তখন হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। প্রাথমিক ক্রিয়া কর্ম শেষ করে পুরোহিত উমানাথ খোকাকে আনতে বললেন। কিন্তু যে ঝি তাকে নিয়ে গেছে তার দেখা নাই। এদিকে শুভ লগ্ন নষ্ট হয়ে যায়।

বিজয় ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে,—কই, এখনও খোকাকে নিয়ে এলো না। সে ঝি গেল কোথায় ?

চারিদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেল। এদিক ওদিক খোঁজবার পর দেখা গেল ঝি খোকাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীর বাইরের বাগানে হাওয়া খাচ্ছে। সকলের ধমক খেয়ে সে খোকাকে কোলে নিয়ে সভামণ্ডপের দিকে ব্যস্তভাবে দৌড়ে গেল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ তখন বাইরের সিঁড়ি দিয়ে মাধবীর সঙ্গে নামছেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তিনি ভীতস্বরে বললেন,—না, আমি যাব না মাধবী! আমি যেতে পারছি না।

বীরেন্দ্রনারায়ণ বুঝি টলেই পড়ে যাচ্ছিলেন, মাধবী তাকে ধরে ফেলে বললে,—একি বাবা! কেন তুমি অমন করছো?

উদ্‌ভ্রান্তভাবে বীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—কেন! কেন! তারপর সভামণ্ডপ প্রবেশ পথের দিকে চেয়ে তিনি হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। সেই সঙ্গেই সভামণ্ডপ থেকে একটা ভীত আর্তনাদ উঠল অসংখ্য লোকের কণ্ঠে।

খোকাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসতে গিয়ে বাইরের চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ঝি খোকাকে শুদ্ধ সজোরে নীচের উঠানে আছাড় খেয়ে পড়েছে।

এক মুহূর্তের একটা রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা!

তারপরই আবার চারিদিক শঙ্কিত ব্যাকুল চীৎকারে মুখর হয়ে উঠল।

জল, জল, ডাক্তার।

একজন গিয়ে খোকাকে মাটি থেকে তুলে নিলে। তার শরীর রক্তাক্ত। কোন সাড়া নেই।

বীরেন্দ্রনারায়ণ ছাইয়ের মত পাংশুমুখে সেদিকে চেয়ে এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ পাগলের মত বলে উঠলেন,—আমি জানতাম, আমি জানতাম মাধবী।

কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেইখানেই বসে পড়লেন। মাধবী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওধারে দেখা গেল, অনিমার কোলে কে খোকাকে এনে তুলে দিয়েছে। খোকার সাড় তখনও ফিরে আসেনি। যন্ত্রচালিতের মত অনিমা তাকে কোলের ওপর ধরে নিয়ে বসে আছে। তার চোখে জল পর্যন্ত নেই। একবার মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে বসে রইল।

কয়েকজন খোকার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিল। কে একজন যেন খবর দিলে ডাক্তারবাবু আসছেন।

নগরের ওপর সন্ধ্যার অন্ধকার হতাশার মত গাঢ় হয়ে এসেছে, দরিদ্র পল্লীতে ধোঁয়ার ও ধূলিতে বিষাক্ত সে অন্ধকার নেমে এসেছে রুদ্ধশ্বাস বেদনার মত, এমন একদিনে পরিতোষ নির্মলাকে আবার খুঁজে পেল।

বাড়ীর বাইরের দাওয়ায় সিঁড়ির ধারে নির্মলা শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে বসে আছে। অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখা যায় না, পরিতোষ ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল।

নির্মলা পদশব্দে মুখ তুলে তার দিকে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। মনে হল পরিতোষকে সে যেন চিনতে পারছে না। অনেকক্ষণ বাদে ক্লান্ত বিষণ্ণকণ্ঠে সে বললে—এসেছ পরিতোষদা। এতদিন বাদে এলে?

এ-কণ্ঠস্বর পরিতোষের কাছেও অপ্রত্যাশিত। হৃদয়ের কোন গভীর ক্ষত থেকে এ-স্বর যেন রক্তাক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে। পরিতোষ কাতরভাবে বললে—আমি যে তোমায় খুঁজে পাইনি নির্মলা। তোমায় খোঁজবার জন্য এতদিন কি না করেছি। এতদিন···

এখন খুঁজে পেয়েছ ত? কিন্তু পেয়ে কি লাভ হল!—নির্মলার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, কথা কেমন যেন অসংলগ্ন।—কি দেখতে তুমি এলে, কাকে দেখতে? খোকাকে? খোকাকে দেখতে?

হঠাৎ নির্মলার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। পরিতোষ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে বললে,—হ্যাঁ খোকা! খোকা কোথায়? কেমন আছে?

নির্মলার দৃষ্টি আবার কেমন যেন বদলে গেল। যেন অত্যন্ত সহজ ভাবে সে ধীরে ধীরে বললে,—খোকা খুব ভাল আছে! খুব ভালো! আর তার কোন অসুখ নেই, কোনদিন আর তার অসুখ হবে না।

পরিতোষ ঠিক কিছু বুঝতে না পেরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বললে,—চল নির্মলা ভেতরে চল!

না, না, ভেতরে যাব না, ভেতরে যেতে পারব না।—নির্মলা আবার যেন কোন দুর্বোধ্য ভয়ে শিউরে উঠল, তারপর অশ্রুরুদ্ধ

কণ্ঠে বললে—ওরা খোকাকে এইখান দিয়ে নিয়ে গেছে, অনেক দূরে নিয়ে গেছে !

পরিতোষের বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না। বেদনায় স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর ব্যথিতকণ্ঠে বললে,—কেন তুমি এমন ক'রে চলে এলে নির্মলা, কেন তুমি এমন করে নিজের সর্বনাশ করলে !

নির্মলা নীরবে তার দিকে শুধু মুখ তুলে তাকালে, কিছু বললে না···

পরিতোষ আবার গভীর অনুশোচনার সঙ্গে বললে, আমি অন্যায় করেছিলাম, মুহূর্তের ভুলে তোমায় অপমান করেছিলাম। তুমি ত আমায় যা খুশী বলতে পারতে, আমাকে যে কোন শাস্তি দিতে পারতে। আমার মুহূর্তের ভুল আমার চিরদিনের লজ্জা হয়ে থাকত। তার বদলে নিজেকে কেন তুমি এমন করে শাস্তি দিলে !

পরিতোষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্মলা বিষণ্ণকণ্ঠে শুধু বললে,—এ-সব কথা থাক পরিতোষদা।

যা হয়ে গেছে তার কোন প্রতিকার নেই জানি, কিন্তু তবু এ আফশোষ যে মরে গেলেও যাবে না যে আমি তোমার সব দুঃখের মূল।—পরিতোষের কণ্ঠে কথাগুলো চাপা আর্তনাদের মত শোনাল।

তা ত সত্যি নয় !—নির্মলা যেন আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেল।

পরিতোষ কিন্তু প্রবোধ মানল না। ব্যাকুলভাবে বললে—তুমি না বল, তবু আমি জানি, আমার অপরাধের সীমা নেই ! আমায় শুধু তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও নির্মলা। তুমি আমার সঙ্গে চল।

নির্মলা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, অদ্ভুত স্বরে বললে,—যাব, তোমার সঙ্গে !

আমি তোমায় কোন অসম্মান করব না নির্মলা ! আমার সমস্ত দুর্বলতা অনুশোচনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

পরিতোষের কণ্ঠে অসীম কাতরতা। গভীর আগ্রহের সঙ্গে

সে আবার বললে,—তোমার জীবনে আর কোন সান্ত্বনাই নেই জানি, তবু একটু শান্তি তোমায় দেবার অধিকার আমায় দাও, আমার নিজের অভাগী বোন মনে করে তোমায় আমি সেবা করব সারা জীবন !

পরিতোষ চুপ করলে নির্মলা খানিক তার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে বললে—আমায় তুমি শান্তি দিতে চাও ?

নির্মলার চোখের দৃষ্টি এবার পরিতোষকে শঙ্কিত করে তুলল। স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বোঝাবার চেষ্টা করলে,—আর ত কিছু দেবার ক্ষমতা আজ আর কারো নেই !

হঠাৎ নির্মলার চোখ যেন জ্বলে উঠল। তীব্রকণ্ঠে সে বললে,—কিন্তু শান্তি আমি চাই না, বুঝেছ, শান্তি নয়। আমি শুধু প্রতিশোধ চাই।

প্রতিশোধ ?

হ্যাঁ, যারা আমার সমস্ত জীবন ছারখার করে দিয়েছে, বিনা দোষে যারা আমায় শাস্তি দিয়েছে, তাদের জীবনও আমি অভিশাপে বিষিয়ে দেব—নির্মলা যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

কি বলছ নির্মলা ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে পরিতোষ।

তিক্ত জ্বালাময় কণ্ঠে নির্মলা জবাব দিলে,—ভাবছ আমি সামান্য পথের ভিখারী, আমি তাদের কি করতে পারি ? সব পারি এখন। একদিন আমার ভয় ছিল, মনের ভয়, লোকলজ্জার ভয়, আজ আমার কিছু নেই। আমি গ্রামে ফিরে যাব।

গ্রামে যাবে !—পরিতোষের কণ্ঠস্বরে শঙ্কিত বিস্ময় !

হ্যাঁ, সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে, নিশ্চিত আরামে যারা দিন কাটাচ্ছে তাদের সামনে আমার নিজের কলঙ্ক নিজে গিয়ে প্রকাশ করব।

নির্মলা যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছে। তার দৃষ্টিতে, তার কণ্ঠস্বরে কি এক উন্মত্ত উত্তেজনা। সত্যিই সে যেন মূর্তিমতী প্রতিহিংসা। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে তখন বলে চলেছে,—জীবন তাদের তারপর বিষিয়ে উঠবে না ! স্ত্রী চমকে উঠবে না স্বামীর মুখের দিকে চাইতে ! ঘৃণায় ভয়ে তাদের বুক শিউরে উঠবে না, সন্দেহে অবিশ্বাসে তাদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে

উঠবে না দিনের পর দিন! আমি তাই যাচ্ছি···এখুনি যাচ্ছি।

উন্মাদিনির মত নির্মলা হঠাৎ ছুটে সেখান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

পরিতোষ কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। নির্মলার এই অপ্রত্যাশিত আত্মপ্রকাশে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সে ব্যাকুলভাবে নির্মলার জন্য চারিদিকে তাকাল।

কোথায় নির্মলা!

রাস্তায় বেরিয়ে সে কোনদিকে তাকে দেখতে না পেয়ে আবার ব্যাকুলভাবে ডাকল,—নির্মলা! নির্মলা!

নির্মলার কোথাও তবু দেখা নেই। এরই মধ্যে গেল কোথায়! পরিতোষ সত্যি শঙ্কিত হয়ে উঠল। প্রায়ান্ধকার গলিতে গলিতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সন্ধান করেও নির্মলাকে কিন্তু পাওয়া গেল না। না পেলেই নয়। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে নির্জন নগরের পথে পরিতোষের ব্যাকুল আহ্বান তাই ধ্বনিত হ'তে লাগল—নির্মলা! নির্মলা!

শহরে নির্মলার কোন খোঁজ না পেয়ে, পরিতোষকে শেষ পর্যন্ত গ্রামেই যেতে হ'ল নির্মলার সন্ধানে। নির্মলার মনের যা বর্তমান অবস্থা, তাতে সত্যিই নিজের সংকল্প কাজে পরিণত করতে তার পক্ষে গ্রামে ফিরে আসা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। কিন্তু পরিতোষকে সে সর্বনাশ নিবারণ করতেই হবে। নির্মলাকে যেমন করে হোক ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তার চাই-ই। গ্রামে এসে পরিতোষ প্রথমে উমানাথের বাড়ীতেই গেল।

উমানাথ তখন বাড়ী থেকে বার হচ্ছিলেন হঠাৎ পরিতোষকে সংকুচিতভাবে ঢুকতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—তুমি!

পরিতোষ বিষণ্ণ মুখে বললে—হ্যাঁ, আবার এলাম। না এসে উপায় ছিল না বলেই এলাম। নির্মলা, নির্মলা কি গ্রামে এসেছে?

নির্মলার মা অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন, নির্মলার নাম শুনে ব্যাকুলভাবে কাছে এসে বললেন,—নির্মলা! তুমি কি বলছ পরিতোষ!

পরিতোষ ব্যথিতস্বরে বললে, জানি আপনারা সবাই ভুল বুঝবেন। এখন সমস্ত কৈফিয়ৎ দেবার সময় আমার নাই। নির্মলার খোঁজ আমার সবার আগে দরকার—বলুন সে এসেছে এখানে?

উমানাথ এবার জবাব দিলেন, সে এখানে আসবে কেন? আসবেই বা কোন সাহসে?—তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু, তাঁর তলায় কত গভীর যে বেদনা আছে তা বেশীক্ষণ চাপা রইল না। একটু চুপ করে থেকে ধরা গলায় তিনি আবার বললেন,—আর তুমিও না এলে পারতে পরিতোষ। আমি কাউকে দোষ দিই না, কিন্তু নির্মলা বলে আমাদের যে কোন মেয়ে ছিল এটুকু আমরা ভুলে থাকতে চেয়েছিলুম সেটুকু দয়াও তোমরা করলে না।

নির্মলার মা আঁচলে চোখ মুছে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেলেন। পরিতোষ খানিক চুপ করে থেকে ব্যথিত স্বরে বললে,—আপনারও শেষে এই বুঝলেন। যাক্, এখন আর আমি কিছুই বলতে পারব না। যদি সময় হয় সবই বুঝতে পারবেন একদিন।

উমানাথ অতি দুঃখের হাসি হেসে বললেন,—আমি সমস্ত বোঝাবুঝির বাইরে চলে গেছি পরিতোষ, কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না। বিজয়ের ছেলের কঠিন অসুখ, এই শান্তি-জল নিয়ে এখুনি আমায় যেতে হবে।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পরিতোষ এবার বললে,—বিজয়ের ছেলের অসুখ, আর আপনি তার জন্য শান্তি জল নিয়ে যাচ্ছেন।

উমানাথ বিষণ্নভাবে আবার হাসলেন, বল্লেন—হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। জমিদার আমার ওপর এইটুকু অনুগ্রহ এখনও রেখেছেন, এখনো আমি তাঁদেরই পুরোহিত।

সবিস্ময়ে তাঁর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে পরিতোষ বললে,—আশ্চর্য! জমিদার মশাইকে আমি বুঝতে পারলুম না, আপনাকেও নয়।

কোন মানুষকেই তেমন করে বোঝা যায় না পরিতোষ! মানুষ সোজা অঙ্কের হিসাব নয়। শান্ত স্বরে কথাগুলি বলে উমানাথ একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন,—তুমি ইচ্ছে করলে আমার এখানেই থাকতে পার এখন!

না, আমি এখানে থাকতে আসিনি, থাকবার উপায় নেই। আমায় এই গাঁয়ের আশে-পাশেই থাকতে হবে, যেমন করে হোক নির্মলাকে আমায় এখান থেকে নিয়ে যেতেই হবে—বলে পরিতোষ বেরিয়ে গেল।

উমানাথ তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্মলার মা অনেক কষ্টে এতক্ষণ বুঝি নিজেকে সংবরণ করেছিলেন। এবার কাছে এসে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি বল্লে পরিতোষ? নির্মলা এখানে আসবে? নির্মলা এখনও বেঁচে আছে?

উমানাথের চোখও বুঝি সজল হয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করে কঠোর স্বরে তিনি বললেন,—ছিঃ ছিঃ, এখনও তার জন্যে ভাবনা! এখনও জান না যে নির্মলা বলে কেউ কখনও ছিল না আমাদের।

নির্মলার মা অশ্রুপ্লাবিত মুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। উমানাথ ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

নির্মলা মুহূর্তের অপ্রকৃতিস্থতায় মিথ্যা কোন সংকল্প করেনি। সত্যিই একদিন ছিন্ন মলিন বেশে উন্মাদিনীর মত গ্রামের পথে তাকে দেখা গেল। কত দীর্ঘ পথ পর্যটন করে কি ভাবে সে সেখানে এসে পৌঁচেছে কে জানে। অনাহারে পথের ক্লান্তিতে শরীর তার শীর্ণ, কিন্তু চোখে তার যেন কি এক অস্বাভাবিক দীপ্তি। চোখের এই বহ্নির ইন্ধন জোগাতেই যেন তার দেহ ক্ষয় হয়ে গেছে।

গ্রামের পথ অতিক্রম করে দেখা গেল জমিদার বাড়ীর দেউড়িতে সে এসে দাঁড়িয়েছে। দারোয়ানেরা তাকে বুঝি ঢুকতে দিতে চায় না।

নির্মলা হিংস্র ভাবে চীৎকার করে উঠল,—ঢুকতে দেবে না, আমায় ঢুকতে দেবে না?

তারপর উন্মাদের মত হেসে উঠে তীক্ষ্ণস্বরে বললে—তাত দেবেই না! আমি যে রাজপুরী ধ্বসিয়ে দিতে এসেছি, আমি যে তোমাদের সর্বনাশ করতে এসেছি—আমি যে এ বাড়ীর অভিশাপ।

চুপ, চুপ মাগী, চেঁচাসনি, চেঁচালে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।—দারোয়ানেরা ধমক দিয়ে উঠল।

একজন তাকে শাসিয়ে জানালে,—জানিস, বাবুর ছেলের অসুখ।

ছেলের অসুখ! নির্মলার কণ্ঠে যেন অমানুষিক উল্লাস। ছেলের অসুখ ত সবে শুরু। এখনও ত কিছুই হয়নি, এখনও অভিশাপ লাগেনি এ বাড়ীর গায়ে! প্রত্যেক ইটখানা যেদিন এর খসে পড়ে যাবে, ভিৎ যেদিন নড়ে উঠবে··

দারোয়ানেরা রুখে উঠল মারমুখি হয়ে,—খবরদার মাগী ফের যদি চেঁচাস—

হঠাৎ ভেতরের উঠানের কাছে কার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—কে ওখানে?

দারোয়ানেরা অনিমাকে দেখে ফিরে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বললে—একটা পাজী ভিখারি মাগী মা, তাড়ালেও যেতে চায় না।

অনিমা একটু এগিয়ে এসে স্নিগ্ধস্বরে আদেশ দিলে,—না, না ওকে তাড়িও না। তারপর নির্মলাকে উদ্দেশ্য করে বললে,—তুমি এস, ভেতরে এস, কিছু মনে ক'রো না ওদের কথায়। ওরা জানে না, তুমি রাগ করে ফিরে গেলে আমার ছেলের অকল্যাণ হবে।

নির্মলা এতক্ষণ ধরে অনিমাকেই একদৃষ্টে লক্ষ্য করেছে। এবার ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে অদ্ভুতভাবে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললে,—তুমি বুঝি এ-বাড়ীর বৌ? তুমি আমায় ডাকছ? আমায় ভেতরে যেতে বলছ?

নির্মলার তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলেও অনিমা স্নিগ্ধ হেসে স্নিগ্ধস্বরে বললে—হ্যাঁ, তুমি ভেতরে এসে বোস, তোমার যা চাই তাই দেব, তুমি রাগ ক'রো না।

নির্মলা আর কোন প্রশ্ন করল না। শুধু তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চারিদিকে লক্ষ্য করতে করতে ধীরে ধীরে অনিমার সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

ভেতরের একটি বারান্দার কাছে তাকে দাঁড় করিয়ে অনিমা স্নিগ্ধ স্বরে বললে,—বোস, আমি এখুনি আসছি।

অনিমা চলে যাবার পর খানিকক্ষণ মনে হ'ল যেন নির্মলা কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। ওপরে কোথা থেকে শিশুর কান্না মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। হঠাৎ নির্মলা সচকিত হয়ে উঠল, তারপর নীচে থেকে সামনের সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গিয়ে সামনের ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

জানালা থেকে ভেতরের সব কিছু দেখা যায়। বিছানার ওপর রুগ্ন শীর্ণ শিশু শায়িত। একজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে। উদ্বিগ্ন কাতর মুখে বিজয়, জমিদার, উমানাথ সবাই সে দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

শিশুটি আবার যন্ত্রণায় কাৎরে কেঁদে উঠল। নির্মলার মনে হ'ল তার চোখের সামনে সব যেন ঝপসা হয়ে আসছে অশ্রুতে।

এই ঘর যেন তার চোখের ওপর আর এক জীর্ণ কুটিরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, নোংরা মলিন শয্যায় যেন তারই শিশু শেষ নিঃশ্বাস টানছে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নির্মলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। সে শব্দে সেদিকে ফিরে চেয়ে বিজয়ই প্রথম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কে? কে ওখানে?

আর সকলেও এবার সচকিত হয়ে জানালার দিকে ফিরে তাকাল। বিজয় তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ক্ষণিক বিভ্রম কেটে গিয়ে আবার নির্মলার মুখ হিংস্র কঠিন হয়ে উঠল। উদ্ধতভাবে এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে,—কে আমি চিনতে পারছ না! ভাল করে দেখ, চিনতে পার কি না? কোনদিন কোনখানে আমায় দেখেছিলে কিনা?

বিজয় যেন হঠাৎ কোন প্রেতমূর্তি দেখছে। সমস্ত মুখ তার ফ্যাকাসে! অস্ফুট কম্পিত স্বরে সে শুধু বললে,—তুমি! নির্মলা।

নামটা এখনো ভোলনি দেখছি! নির্মলার কণ্ঠ আবার হিংস্র হয়ে উঠল,—আমিও ভুলিনি, কোন কিছুই ভুলিনি। তাই ত এসেছি এতদূর থেকে তোমাদের দেখতে, তোমাদের সর্বনাশ দেখতে। ওই বুঝি তোমার ছেলে বিছানায় শুয়ে মরছে, যেমন করে আমার ছেলে মরেছে, দিনের পর দিন, বিনা ওষুধে, না খেতে পেয়ে! তোমাদের অনেক টাকা আছে, অনেক ক্ষমতা,—তবু ও

ছেলে বাঁচবে না—আমার অভিশাপ—আমার মরা ছেলের অভিশাপ—

নির্মলার উন্মত্ত চিৎকার ছাপিয়ে আর একটি বজ্রগম্ভীর স্বর এবার শোনা গেল,—নির্মলা !

নিরীহ ভাল মানুষ উমানাথের চেহারা একেবারে যেন বদলে গেছে। বহ্নিদীপ্ত মূর্তিতে তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন।

নির্মলার হঠাৎ যেন চমক ভেঙ্গে গেল। প্রায় সশঙ্ক দৃষ্টিতে উমানাথের দিকে তাকিয়ে সে কম্পিত স্বরে ডাকলে,—'বাবা !'

কিন্তু উমানাথ গর্জন করে উঠলেন,—না, আমি তোমার বাবা নই। তুমি আমার মেয়ে নও। আমার মেয়ে মরে গেছে—অনেকদিন মরে গেছে ; আমার মেয়ে বেঁচে থাকলে, নিজে পুড়ে খাক্ হলেও আর কারুর সংসারে হিংসার আগুন ধরাতে আসত না। তোমার ছেলে মরে গেছে বলছ ? তুমি মা নও, তাই সে তোমায় ছেড়ে গেছে। মা হ'লে এই রুগ্ন মরতে-বসা ছেলের ঘরে এসে তুমি অভিশাপ দিতে পারতে না।

একটু থেমে আবার বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন,—তুমি যাও ! এখনও যদি লজ্জা থাকে ত গিয়ে সত্যি করে মর।

নির্মলার যেন এক মুহূর্তে আবার গভীর রূপান্তর ঘটে গেছে। কোন কথা আর তার মুখ দিয়ে বার হ'ল না। অসহায় কাতরভাবে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্কোচে গ্লানিতে মাথা নীচু করে অশ্রুসজল চোখে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ আর বুঝি সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি যেন আর্তনাদের মত বলে উঠলেন,—না, না, ওকে যেতে দিও না। ও ফিরে গেলে এ সংসারে সত্যি অভিসম্পাত লাগবে !

অনিমা কিছুক্ষণ আগে থাকতেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে তাকে এবার চলে যেতে দেখা গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বিজয় তাঁকে বাধা দিতে তিনি যেন পাগলের মত অস্থির হয়ে উঠলেন,—তোরা জানিস না, সমস্ত অপরাধ আমার ! মিথ্যে বংশের অভিমানে অন্ধ হয়ে আমি ওর জীবন

ছারখার করে দিয়েছি। সব জেনেও ওর নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটনায় সাহায্য করে তোর মন ভেঙ্গে দিয়েছি, জোর করে তোদের তফাৎ করে ওর সর্বনাশ করেছি!

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বিজয় কঠিন স্বরে বলে উঠল,—বাবা!

জমিদার পরম অপরাধীর মত কুণ্ঠিত কাতর স্বরে বললেন,—আমার বিচার পরে করিস বিজয়, আগে ওকে ফিরিয়ে আন। নইলে আমি জানি এ বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, ওর দীর্ঘনিঃশ্বাসে সব ছাই হয়ে যাবে।

বিজয়ের হাত ছাড়িয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই এবার ছুটে গেলেন বাইরে।

অনিমা আগেই সেখানে গিয়ে নির্মলার কাছে দাঁড়িয়েছে।

বীরেন্দ্রনারায়ণ কাছে গিয়ে কাতরস্বরে বললেন,—তুমি ফিরে এস মা, আমাদের ক্ষমা করে তুমি ও ছেলেকে বাঁচিয়ে তোল।

চল দিদি, আমি তোমায় মিনতি করছি।—অনিমা এবার নির্মলার হাত ধরলে।

বিহ্বলভাবে অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর সংকুচিত অস্ফুট কণ্ঠে নির্মলা বলে,—আমি! আমি যাব?

স্নিগ্ধস্বরে অনিমা বললে,—হ্যাঁ দিদি, তুমি এসে কোলে তুলে নিলে ও যদি বাঁচে।

নির্মলা তবু বিমূঢ় বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিমা সকরুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবার বললে,—আমি সব জানি দিদি, ঠাকুরঝির কাছে সব শুনেছি। শুধু কাউকে কিছু বলবার উপায় নেই বলে, মুখ বুজে থেকেছি। তোমাদের কাঁদিয়ে এ সুখ আমি চাই না দিদি। চল।

নির্মলাকে নিজেই সে এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ঘরের দিকে। যন্ত্রচালিতের মত মনে হল নির্মলাকে—নিজের কোন শক্তি আর যেন নেই।

তখন ডাক্তারবাবু ছাড়া সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নির্মলাকে নিয়ে অনিমা শিশুর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ডাক্তারবাবু তাদের দিকে চেয়ে কি বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অশ্রু-সজল চোখে বীরেন্দ্রনারায়ণ ও উমানাথ এ-দৃশ্য দেখছিলেন।

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন,—আর আমার বিশেষ কোন দরকার হবে বলে মনে হয় না চৌধুরী মশাই।

বীরেন্দ্রনারায়ণের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল, বললেন,—না ডাক্তার, আর ভয় নেই আমি জানি। কি বল উমানাথ ?

হঠাৎ আনন্দে সব কিছু ভুলে, তিনি উমানাথের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

বিজয় ডাক্তারকে বাইরে এগিয়ে দিয়ে তখন ফিরছে, হঠাৎ পেছন থেকে পরিতোষ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে,—নির্মলা ! নির্মলা এখানে এসেছে শুনলাম !

বিজয় একটু হেসে বললে,—হ্যাঁ, এসেছে।

পরিতোষ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বললে,—আমি সারাক্ষণ পাহারায় ছিলাম বিজয়, সত্যি আমি ওকে আসতে দিতাম না কিছুতেই। তোমরা ওকে কিছু বোল না। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। ও তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

বিজয় আবার অদ্ভুতভাবে হেসে বললে,—না, বোধ হয়।

কই কোথায় সে ?—ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে পরিতোষ।

চল দেখাচ্ছি। বলে বিজয় তাকে ঘরের জানালার বাইরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

সবিস্ময়ে পরিতোষ ভেতরে চেয়ে দেখলে। দেখা গেল নির্মলা শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে তার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। নির্মলার কাঁধেই মাথা রেখে অনিমাও চেয়ে আছে সেই দিকে। পরিতোষের উৎকণ্ঠিত মুখ ধীরে ধীরে প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল।

আর এক জানালায় তখন দুর্ধর্ষ জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ ও নিরীহ পুরোহিত উমানাথ এক সঙ্গে চোখ মুছছেন।